উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

চতুর্থ সেমেস্টার

ঐচ্ছিকপত্র – ৪০৩

বৈষ্ণব সাহিত্য

পর্যায় – খ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

FOREWORD

The Self Learning Material (SLM) is written with the aim of providing simple and organized study content to all the learners. The SLMs are prepared on the framework of being mutually cohesive, internally consistent and structured as per the university's syllabi. It is a humble attempt to give glimpses of the various approaches and dimensions to the topic of study and to kindle the learner's interest to the subject

We have tried to put together information from various sources into this book that has been written in an engaging style with interesting and relevant examples. It introduces you to the insights of subject concepts and theories and presents them in a way that is easy to understand and comprehend.

We always believe in continuous improvement and would periodically update the content in the very interest of the learners. It may be added that despite enormous efforts and coordination, there is every possibility for some omission or inadequacy in few areas or topics, which would definitely be rectified in future.

We hope you enjoy learning from this book and the experience truly enrich your learning and help you to advance in your career and future endeavours.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় – ক

একক ১ - বিদ্যাপতির পদাবলী: স্থান-কাল প্রেক্ষিত প্রসঙ্গ

একক ২ - বিদ্যাপতি ও তাঁর পদাবলীর পরিচয়

একক ৩ - বিদ্যাপতির পদ বিশ্লেষণ

একক ৪ - বিদ্যাপতির পদাবলীর বিভিন্ন দিক বিচার

একক ৫ - চণ্ডীদাসের পদাবলী : স্থান-কাল প্রেক্ষিত পরিচয়

একক ৬ - চন্ডীদাসের পদ বিশ্লেষণ

একক ৭ - চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিভিন্ন দিক বিচার

পর্যায় – খ

একক ৮ - গোবিন্দদাসের পদাবলী: স্থান-কাল প্রেক্ষিত প্রসঙ্গ

একক ৯ - কবি পরিচয় ও পদ বিশ্লেষণ

একক ১০ - গোবিন্দদাসের পদাবলীর বিভিন্ন দিক বিচার

একক ১১ - চৈতন্য ভাগবত: স্থান-কাল প্রেক্ষিত প্রসঙ্গ

একক ১২ - কবি ও তাঁর কাব্যের পরিচয়

একক ১৩ - চৈতন্যভাগবত: পাঠ ও আস্বাদন

একক ১৪ - চৈতন্যভাগবত- এর বিভিন্ন দিক ও আঙ্গিক বিচার

ঐচ্ছিকপত্র – ৪০৩ বৈষ্ণব সাহিত্য

একক ৮

গোবিন্দদাসের পদাবলী: স্থান-কাল প্রেক্ষিত প্রসঙ্গ- উদ্দেশ্য, গ্রন্থ পাঠে স্থান-কালের প্রেক্ষিতের প্রয়োজনীয়তার কারণ, ষোড়শ শতকের রাঢ়বঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, ষোড়শ শতকের রাঢ়বঙ্গের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, ষোড়শ শতকের রাঢ়বঙ্গের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট ।

একক ৯

কবি পরিচয় ও পদ বিশ্লেষণ- গোবিন্দদাসের পরিচয় , গোবিন্দদাস: নাম সমস্যা তথা একাধিক গোবিন্দদাস প্রসঙ্গ , পূর্বরাগের পদে গোবিন্দদাস , অনুরাগের পদে গোবিন্দদাস , অভিসারের পদে শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দ দাস , মানের পদে গোবিন্দদাস , কলহান্তরিতা পদে গোবিন্দদাস , মাথুর পদে গোবিন্দ দাস , মিলনের পদে গোবিন্দদাস , রাসলীলার পদে গোবিন্দদাস , গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দ দাস ।

একক ১০

গোবিন্দদাসের পদাবলীর বিভিন্ন দিক বিচার- গোবিন্দদাসের পদে রাধা-কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা, ব্রজবুলিতে কৃতিত্ব, আঙ্গিক নির্মাণ ও

সঙ্গীত প্রবণতা-নাটকীয়তা-চিত্রময়তায় শ্রেষ্ঠত্ব, গোবিন্দদাসের পদে ছন্দ ও অলংকার, গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতির তুলনা।

একক ১১

চৈতন্য ভাগবত: স্থান-কাল প্রেক্ষিত প্রসঙ্গ- উদ্দেশ্য, বৃন্দাবন দাসের কাল, ষোড়শ শতকের তৎকালীন রাঢ়বঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, ষোড়শ শতকের তৎকালীন রাঢ়বঙ্গের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, ষোড়শ শতকের তৎকালীন রাঢ়বঙ্গের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট,

একক ১২

কবি ও তাঁর কাব্যের পরিচয়- উদ্দেশ্য, কবি বৃন্দাবন দাসের পরিচয়, চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের উৎস নির্ণয়, চৈতন্যভাগবত গ্রন্থটি রচনা কারণ, চৈতন্যভাগবত: পুঁথি ও মুদ্রণ প্রসঙ্গ, চৈতন্যভাগবত: পাঠান্তর প্রসঙ্গ, কবি বৃন্দাবন দাস সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত

একক ১৩

চৈতন্যভাগবত: পাঠ ও আস্বাদন- উদ্দেশ্য, চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত গদ্যরূপ, শ্রীচৈতন্য চরিত্র-চিত্রন, নিত্যানন্দ চরিত্র-চিত্রন,

অন্যান্য চরিত্র-চিত্রন, নামকরণ প্রসঙ্গ , চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা , চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে সমাজ চিত্র ।

একক ১৪

চৈতন্যভাগবত- এর বিভিন্ন দিক ও আঙ্গিক বিচার- বৈষ্ণব জীবনীকার হিসাবে বৃন্দাবন দাসের কৃতিত্ব, বর্তমান কালের দৃষ্টিতে চৈতন্যভাগবত- এর প্রয়োজনীয়তা, বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ দুটির তুলনা, চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের ভাষা-ছন্দ ও অলংকার ।

একক: ৮ : গোবিন্দদাসের পদাবলী: স্থান-কাল প্রেক্ষিত প্রসঙ্গ

বিন্যাসক্রম

৮.১। উদ্দেশ্য

৮.২। গ্রন্থ পাঠে স্থান-কালের প্রেক্ষিতের প্রয়োজনীয়তার কারণ

৮.৩। ষোড়শ শতকের রাঢ়বঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

৮.৪। ষোড়শ শতকের রাঢ়বঙ্গের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

৮.৫। ষোড়শ শতকের রাঢ়বঙ্গের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট

৮.৬। অনুশীলনী

৮.৭। গ্রন্থপঞ্জি

৮.১। উদ্দেশ্য

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে যে তিনজন মহাজন স্বনামধন্য, তাঁরা হলেন চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সুবর্ণযুগ হিসাবে খ্যাত। এই খ্যাতির অন্যতম কারণ বিপুল বৈষ্ণব সাহিত্য রচনার ধারা। এই ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম বৈষ্ণব কবি হলেন গোবিন্দদাস। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পাঠগ্রহণ করার ক্ষেত্রে মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিভাগ আছে। তবে তাদের মধ্যে অন্যতম বিভাগটি হল বৈষ্ণবসাহিত্যের ধারা। বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠগ্রহণের ক্ষেত্রে গোবিন্দদাস এমনই একজন প্রতিভাবান কবি, যাঁকে বাদ দিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের পাঠগ্রহণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই মধ্যযুগের সাহিত্যপাঠের ক্ষেত্রে কবি গোবিন্দদাস পৃথকভাবে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

গোবিন্দদাস-এর সামগ্রিক রচনাধারার পাঠগ্রহণ করে, তা বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বৈষ্ণব কবির রচনাধারার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে গোবিন্দদাসের রচনারীতির সঙ্গে সামগ্রিক পরিচয় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগের, বিশেষ করে ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যের গতি প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাবে। স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা যাচ্ছে মধ্যযুগের প্রতিভাধর কবি জ্ঞানদাস একবিংশ শতাব্দীতেও একদিক থেকে প্রাসঙ্গিক এবং একান্তভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার্থীদের নিকট অবশ্যই পাঠ্য কবি।

গোবিন্দদাস মধ্যযুগের কবি হয়েও অসাধারণ কবিপ্রতিভাবলে যুগাতিশায়ী ভাবধারার অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন তিনি বাংলা, ব্রজবুলি এবং বাংলা মিশ্রিত ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেছেন। আর মধ্যযুগের কবিকুলের মধ্যে আধুনিকতার বিচারে কবি গোবিন্দদাসকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তাঁর কবিপ্রতিভা বিশ্লেষণের স্থানে তা প্রমাণ হবে। সাধারণভাবে এটুকু বলতে বলতে হয় যে মধ্যযুগে এতখানি রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। গোবিন্দদাস ছিলেন একজন সচেতন শিল্প স্রষ্টা। তাঁর অনুভূতি প্রকাশের ভাষাজ্ঞান ছিল অসাধারণ । সার্থক শব্দ ব্যবহারে কাব্য কিভাবে রসমন্ডিত হয়, তার পরিচয় গোবিন্দদাসের কবি প্রতিভায় ধরা পড়েছে। সবদিক বিচার করে বলতে হয় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কবি গোবিন্দদাসের কাব্য পাঠকের নিকট হৃদয়হরণ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তারই আলোকে কবি বর্তমান কালের প্রেমের স্বাদ কাব্যে এনে দিয়েছেন। তবে স্বীকার্য যে, গোবিন্দদাসের পদে ঐশ্বরীয় ভাবনা অপেক্ষা প্রেম-বোধই অধিকভাবে প্রকাশিত। এখানেই কবি গোবিন্দদাসের বিশিষ্টতা।

প্রত্যেক কবিকে বুঝতে হয় তাঁর সমাজ-প্রেক্ষিত ও সময়ের চালচিত্র অনুসারে। গোবিন্দদাসের আবিভাবকালেও তাঁর সামাজিক পরিমন্ডল সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া এই এককের উদ্দেশ্য।

৮.২। গ্রন্থ পাঠে স্থান-কালের প্রেক্ষিতের প্রয়োজনীয়তার কারণ

প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে বড়ো হন। একজন ব্যক্তির পরিপূর্ণতা লাভের ক্ষেত্রে তাহলে দুটি মুখ্য উপাদান কার্যকরী ভূমিকা নেয়। একটি হল সমসাময়িক কাল,আর অন্যটি পরিচিত পরিবেশ। সাহিত্যিক সুনির্দিষ্ট সময়ে এবং সুপরিচিত পরিবেশে থেকেও অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশ-নিরপেক্ষ হন। মধ্যযুগের সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে সাহিত্যিকগণ নৈর্ব্যক্তিক কথা বলার চেষ্টা সবসময়ই করেছেন সত্য, কিন্তু সমসাময়িক কাল ও পরিচিত পরিবেশকে অতিক্রম করতে পারেননি। মধ্যযুগের সাহিত্যিকদের রচনায় অনিবার্ধভাবে সমসাময়িক কাল ও পরিচিত পরিবেশ ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

পৃথকভাবে বাংলার মধ্যযুগের কোনো ইতিহাসই লেখা হয়নি। বর্তমান কালের ঐতিহাসিকগণ মধ্যযুগের ইতিহাস লিখেছেন, এই সাহিত্যিকদের সাহিত্যে পাওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে। ষোড়শ, সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস এঁদের গ্রন্থকে বাদ দিয়ে ভাবাই যায় না।

মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যধারার ইতিহাসে বৈষ্ণব কবি ও দার্শনিকদের রচনা হল সমকালীন বাংলার ইতিহাস। মধ্যযুগের ইতিহাস সংগ্রহে মঙ্গল কাব্যধারার ক্ষেত্রেও এ একই কথা প্রযোজ্য। বাংলার পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস জানার জন্য প্রামাণ্য গ্রন্থ হল কবিকঙ্কণ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস হল ভারতচন্দ্রের আন্নদামঙ্গল গান। কমবেশি সকল সাহিত্য পাঠকালে স্থান ও কালের প্রেক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

বর্তমান আলোচ্য কবি গোবিন্দদাস-এর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে মধ্যযুগের বিশেষ করে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার বিভিন্ন বিষয়ের ইতিহাসের নানা তথ্য সংগ্রহ করা যায়। গোবিন্দদাস-এর জীবন সময়কাল ও রচনাবলী পাঠের মাধ্যমে এ সময় কালের বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস তো জানা যায়ই, সেই সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন বিষয়ের

ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। অনুমান গোবিন্দদাস বর্ধমান জেলার শ্রীখন্ড গ্রামে সম্ভবতঃ ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মলাভ করেন। তা যদি হয় গোবিন্দদাস ষোড়শ শতাব্দীর কবি এবং রাঢ়বঙ্গের কবি। তাঁর রচনার মধ্যে ষোড়শ শতকের রাঢবঙ্গের অনেক ইতিহাসই আভাসে ইঙ্গিতে পাওয়া যায়।

যে কোনো সাহিত্যিককে পূর্ণভাবে জানতে গিয়ে সেই সাহিত্যিকের স্থান ও কালের প্রেক্ষিতটি প্রথমেই আলোচনা ও জানার প্রয়োজন। সাহিত্যিকের জীবৎকাল এবং সমকালের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানলে তবেই সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম যথাযথ আস্বাদন করা যায়। সাহিত্যিকের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে সাহিত্যের দরজায় প্রবেশ করাই যথাযথ। গোবিন্দদাসকে আস্বাদন করতে হলে তাই প্রথমেই পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর রাঢ় বাংলার প্রেক্ষিতটি নিখুঁতভাবে উপলব্ধি করা জরুরি।

৮.৩। ষোড়শ শতকের রাঢ়বঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

ষোড়শ শতাবী হল গোবিন্দদাসের কাল। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতকের রাঢবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসটি বর্তমান আলোচনার অন্তভূক্ত। বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রাষ্ট্রবিপর্যয়ে যেমন দেশের শিল্পসাহিত্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়, তেমনি দেশে সুশাসন বজায় থাকলে শিল্প-সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটে থাকে। বাংলা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে রাষ্ট্রযন্ত্র যতবার হস্তান্তরিত হয়েছে, ততবারই সাহিত্যের ইতিহাসেও গতিপথের পরিবর্তন ঘটেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে, হিন্দু রাজত্বের অবসানে বাংলাদেশে এক যুগান্তর দেখা দেয়, দীর্ঘদিনের অরাজকতা ও দুঃশাসনের ফলে সেই যুগে আর কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচনা হয়নি। পরে ইলিয়াস-শাহী শাসন প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে আর সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যেরও জাগরণ ঘটল। ইলিয়াস বংশের অবসানের পর রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরগণ এবং সুলতান হোসেন শাহ ও তাঁর বংশধরগণ গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। হোসেন শাহের বংশের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা দেশে স্বাধীন সুলতানি আমল প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সঙ্গে পাঠান শাসনকালের সমাপ্তি ঘটে। এই

সুলতানি শাসনকালে বাংলাদেশে অনেকখানি সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই কালেই বাংলা সাহিত্য রচনার নতুন করে উদ্যোগ দেখা দেয়। রাষ্ট্রব্যবস্থা এরপর মুঘল সম্রাটদের হাতে চলে যায়, বাংলা সাহিত্যেরও মোড় ঘুরল। পাঠান-শাসনকালকে বাংলা সাহিত্যের 'আদি-মধ্য' যুগ এবং মুঘল শাসনকালকে 'অন্ত্য-মধ্য' যুগ নামে অভিহিত করা হয়।

মুসলমান শাসকগণ বিজাতীয় হলেও বাংলা তাদের কর্মভূমি ছিল ভেবে তাঁরা হিন্দু মুসলমান-নির্বিশেষে বহু বাঙালিকেই রাজসভায় স্থান দেন। এবং বাঙালি সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দিয়েছেন, আবার এও দেখা গেছে বাঙালি সাহিত্যিকের রাজার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও কবি সশ্রদ্ধভাবেই রাজার নাম সাহিত্যে উল্লেখ করেছেন। "এ প্রসঙ্গে অপর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। এই পাঠান-শাসকগণ ধর্মে, ভাষায় এবং জাতীয়তায় মূলতঃ বাঙালি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হলেও এ অঞ্চলে স্থায়ী বসবাস হেতু বস্তুতঃ বাঙালিই হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা কেউ আর স্বদেশে ফিরে যাননি, পুরুষানুক্রমে এখানেই অবস্থান করেছেন। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়া ছিল একান্ত স্বাভাবিক পরিণতি। হয়তো বা বাংলা ভাষায় বাগ্ ব্যবহারেও তাঁরা আর অনভ্যস্ত ছিলেন না। কাজেই বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের প্রীতি অকারণ বা অযৌক্তিক ছিল না।" (সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য)।

ইলিয়াস শাহি বংশের রাজত্বকালের মাঝখানে কিছুকালের জন্য হিন্দু রাজা গণেশ এবং তাঁর বংশধরগণ রাজত্ব করেছিলেন, তা কবি কৃত্তিবাসের রচনা থেকে জানা যায়। গণেশের বংশধরদের হাত থেকে গৌড়ের শাসনভার আবার ইলিয়াস শাহি সুলতানি বংশের হাতে চলে যায়। এই বংশের রুকন্উদ্দীন বরবক শাহ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'গ্রন্থ রচয়িতা মালাধর বসুকে 'গুণরাজখান' উপাধি প্রদান করেন। মালাধর বসু কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছেন "গৌড়েশ্বর দিল নাম গুণরাজখান"।

হোসেনশাহ বাংলার মুসলমান সুলতানদের মধ্যে সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি লাভ ঘটে। তাঁর সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। হোসেন শাহের দরবারে সমাদৃত বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে অনেকেই উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য -সাহিত্য রচনা

করেছেন। সনাতন গোস্বামী, রূপগোস্বামী, যশোরাজ খান, বিজয়গুপ্ত এবং বিপ্রদাস পিপিলাই হোসেন শাহের সময়েরই পন্ডিত।

সুলতান হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহও যে বাংলার কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তার প্রমাণ আছে বাংলার ছোট বিদ্যাপতি কবিরঞ্জনের রচনায়। নসরৎ শাহের পুত্র ফিরোজ শাহ অল্প কাল রাজত্ব করলেও তিনিও বাংলা ভাষার কবিদের উপযুক্ত সমাদর করতেন। হোসেন শাহের লস্কর (সেনাপতি) পরাগল খাঁ চট্টগ্রামের শাসক ছিলেন। তাঁর আদেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কবীর পরমেশ্বর মহাভারত রচনা করেন। যা 'পরাগলী মহাভারত' নামে খ্যাত। পরাগল খাঁর পুত্র 'ছুটি খাঁ'-র পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের অনুবাদ করেন।

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহকে হত্যা করে তাঁর পিতৃব্য আব্দুল বদর গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ নাম নিয়ে পাঁচ বছর গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে আফগান বীর শেরশাহ গৌড় অধিকার করেন। শের শাহ কিছু কালের জন্য দিল্লির সিংহাসনেও বসেন। তাঁর বংশের নাম 'শূরবংশ'। শেরশাহ দিল্লি থেকে গৌড়বঙ্গের শাসন পরিচালনা করতেন। তিনি পাঁচ বছর দিল্লি সিংহাসনে আসীন থাকার পর তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ্ পিতৃপদে আসীন হন।

১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এক আত্মীয় মুহম্মদ শাহ আদিল কিছুদিনের জন্য দিল্লির অধিকার হস্তগত করেন। অল্পকাল মধ্যে আকবর শাহের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে। এই সময় অথাৎ ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহের এক কর্মচারী তাজ খাঁ করনানি বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন এবং 'করনানি' বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৫৬৫ গ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুতে অনুজ সুলেমান খাঁ বাংলার সুলতান হন। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর অল্পকালের জন্য তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়োজিদ এবং পরে কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ খাঁ বাংলার সিংহাসনে বসেন। দাউদ খাঁ বাংলার রাজধানী গৌড় থেকে 'টাঁড়া'-য় স্থানান্তরিত করেন। ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁ রাজধানী 'টাঁড়া'

অধিকার করেন। করনানি বংশের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পাঠান রাজত্বেরও সমাপ্তি হয়। এরপরেই গৌড়বঙ্গে মুঘল শাসনের সূত্রপাত।

বাংলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে অবশ্যই বেশ কিছুটা সময় লাগে। বাংলায় দিল্লির প্রথম সুবেদার নিযুক্ত হয়েছিলেন 'হুসেন কুলি বেগ'। ইনি 'খান-ই-জাহান' উপাধি নিয়ে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুবেদারি করেছিলেন। এরপর মুজাফফর খাঁ তুরবাতির সুবেদারি কালে বাংলার বুকে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা নেমে আসে । ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে বাদশা আকবর মানসিংহকে গৌড়-বাংলায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও সুশাসন-ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সুবেদার নিযুক্ত করেন। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই মানসিংহ সমগ্র বাংলায় মোটামুটি শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। আর এই ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দেই আকবরের মৃত্যু ঘটলে একটা যুগের অবসান ঘটে গেল। আলোচ্য ভারতবর্ষ তথা বাংলার রাজনৈতিক কালটিই হল কবি গোবিন্দদাসের কাল।

৮.৪। ষোড়শ শতকের রাঢ়বঙ্গের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

যোড়শ শতাব্দী রাঢ়বঙ্গ তথা সমগ্র বঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়। যোড়শ শতাব্দীতে রাঢ়বাংলার আর্থ-সামাজিক চিএ খুব খারাপ না থাকলেও একেবারে সচ্ছল ছিল না। যোড়শ শতকের আর্থসামাজিক চিত্রটি কবি মুকুন্দের কাব্যে অনেকটাই উদ্ভাসিত হয়েছে। কবির ব্যক্তি-জীবনের দুঃখ এবং সেই দুঃখের ইতিহাস থেকেই ষোড়শ শতকে রাঢ় বাংলার অথনৈতিক চিএটি বুঝতে অসুবিধা হয় না।

মুকুন্দ যে আত্মজীবন-কাহিনি দিয়েছেন তাতে যোড়শ শতকের নবাব জমিদারদের পরিষদদের অত্যাচারের চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি লেখনী দিয়েই প্রজাসাধারণের দুর্দশা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। জমিদারের পার্ষদদের অত্যাচারে মুকুন্দের মত কত অসহায় মানুষকে ভিটে মাটি ছেড়ে অসহায়ভাবে চলে যেতে হয়েছে। তাঁদের অভিজ্ঞতা হয়েছে 'তৈল বিনা কৈল স্নান করিলুঁ উদকপান শিশু কাঁদে ওদনের তরে।'

কবির এই ব্যক্তিজীবনের অসহায়তার মধ্য দিয়ে সাধারণ প্রজাদের দুর্দশার চিত্রটি আমাদের চোখে ফুটে ওঠে। সবচেয়ে বড়ো কথা কবি মুকুন্দ ছিলেন রাঢ়বাংলার মানুষ।

মুকুন্দের কালকেতু ও পশুসমাজের বর্ণনার মধ্যে পাই "নেউগি চৌধুরী নই, না রাখি তালুক।" এই বর্ণনার মধ্যে জমিদার ও সাধারণ প্রজাদের ব্যবধানের ইঙ্গিতটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। হরগৌরীর দারিদ্রের বর্ণনার মধ্যে ষোড়শ শতকে রাঢ়বাংলার আর্থসামাজিক চিত্র স্পষ্ট হয়।

যোড়শ শতকের বাংলার আর্থসামাজিক চিত্রটি বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থেও খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নবদ্বীপ বর্ণনা কালে বৃন্দাবন দাস বলেছেন-

"বাসলী পূজয়ে কেহ নানা উপচারে।

মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে।।"

মানুষের আর্থিক সংগতি যেমনই থাকুক ঐসময়ের মানুষ উৎসব পরায়ণ ছিলেন। তার বর্ণনা আলোচনাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এইরকম ষোড়শ শতকের সাহিত্যিকদের নানা বর্ণনার মধ্যে ষোড়শ শতকের রাঢ়বাংলার অর্থনৈতিক অসহায়তা স্পষ্ট হয়েছে। হয়তো গ্রামের সাধারণ কৃষিজীবী মানুষদের অন্নাভাব ছিল না কিন্তু খাজনা আদায়ের জন্য তহশিলদারদের অত্যাচার লেগেই ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে ঘন ঘন শাসক পরিবর্তন হয়। এটিও ছিল সাধারণ গ্রামীণ প্রজাদের দুর্দশার অন্যতম কারণ। এই শতাব্দীতে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসটি ছিল খুবই বৈচিত্রপূর্ণ। এই এক শতাব্দীতেই পাঠান আমলের চূড়ান্ত বিকাশ, অবক্ষয় এবং মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। এই শতাব্দীতেই বাঙালির দেশগত স্বাতন্ত্র্যের বিনাশ, সামন্ততন্ত্রের শক্তিক্ষয় এবং মুঘল সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী শাসননীতি- ফলে দেশ প্রচণ্ড শাসন ও শোষণের সম্মুখীন হয়। রাজনৈতিক উত্থান পতনের ভাঙাগড়ায় বাংলার যে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটি পাওয়া গেল, এ প্রেক্ষাপটের ঘূর্ণ্যাবর্তটি হল কবি গোবিন্দদাসের কাল।

৮.৫। ষোড়শ শতকের রাঢ়বঙ্গের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট

শ্রীচেতন্যের আবির্ভাব কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ (১৪৮৬)। তাহলে শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত সময়টি হল খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী। এই সময়ের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় চালচিত্রই বর্তমান আলোচনার বিষয়।

সেন রাজত্বকালে ত্রয়োদশ শতকের তুর্কি বিজয়ের পর থেকে ইংরেজ রাজত্বের প্রাককাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় ধরে বাংলা মুসলমান শাসনাধীন ছিল। মাঝখানে মাত্র কয়েক বছরের জন্য গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে বসেছিলেন একমাত্র হিন্দু নরপতি দনুজমর্দন রাজা গণেশ (১৪১৪ - ১৪১৮)। তাই প্রাক্‌চৈতন্য বাংলার ধর্মসমাজ বলতে মূলত দুটি ধর্মসমাজকেই বোঝাত- হিন্দু এবং মুসলমান। মুসলমানদের বাংলাদেশে আসার আগে এদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন প্রভৃতি ধর্মের পৃথক অস্তিত্ব থাকলেও এ সকল ধর্মসম্প্রদায় মূলত একই বৈদিক বা আর্য ধর্ম থেকে উদ্ভূত। পরবর্তীকালে এসকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেকার স্বাতন্ত্য ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যায়। ফলে মুসলমানগণ এদেশে যখন স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে তখন থেকেই তারা এদেশের জাতি-ধর্ম-সমাজকে 'হিন্দু', এই নামে চিহ্নিত করে।

১২০২ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি আক্রমণোত্তর বাংলাদেশে মুসলমান সমাজ গড়ে ওঠে। শিক্ষা-দীক্ষায়, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তুর্কি সেনারা খুব উন্নত ছিল না। অত্যাচারী রাজশক্তি অনেকসময় বলপ্রয়োগে, ভয় দেখিয়ে, কখনও বা কৌশলে নিম্নশ্রেণির হিন্দুকে মুসলমান ধর্মগ্রহণে বাধ্য করে। চতুবর্ণ বিভাজিত হিন্দু সমাজে উচ্চবর্ণের পীড়নে ও ঘৃণায় প্রান্তিক হয়ে যাওয়া নিম্নবর্গের হিন্দু ও আদিবাসী সম্প্রদায় জাতিভেদের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। উচ্চ রাজপদ প্রাপ্তির প্রলোভনে অনেক অভিজাত-বর্ণ হিন্দুও ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। রাজ্য গণেশের পুত্র যদুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ উদাহরণ। মুসলমান সমাজের এক্যবোধ, ভ্রাতৃত্বের আদর্শ, উচ্চ-নীচ সকলের যোগ্যতা অনুযায়ী উচ্চ রাজপদে অভিষিক্ত হবার সুযোগ প্রভৃতি বাংলার হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের একটি কারণ, অন্যদিকে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের যথেচ্ছ অত্যাচার, 'জিজিয়া' প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণির উচ্চ হারে কর আরোপ, রাজনৈতিক

অধিকার থেকে বঞ্চিত করা প্রভৃতিও বাংলার হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে প্রলুব্ধ করেছিল।

"পঞ্চদশ-যোড়শ শতকের অন্তর্বতীকালে রচিত 'সেক সুভোদয়া' গ্রন্থে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন দোর্দন্ড প্রতাপ এক শেখের বর্ণনা থেকে মনে হয়, তুকী আক্রমণের আগেই এদেশে মুসলমান ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রটি প্রশস্ত হয়েছিল। যোড়শ শতাব্দীতে বাংলায় ধর্মান্তরিত মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। যারা ধর্মান্তরিত হয় তাদের বেশীর ভাগই ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু।" (বাঙালির মনন: নানা নিবন্ধ; কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)।

বাংলার পাল রাজারা ধর্মে ছিলেন বৌদ্ধ, আর সেন রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের। সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুথানের ফলে বাংলায় বসবাসকারী অনেক বৌদ্ধ ভীত হয়ে হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিশে যায়।

যোড়শ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক অবস্থাটি ছিল এলোমেলো । তাদের ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণাও ছিল না। ফারসি কিছু কিছু জানলেও আরবি তারা বুঝত না বলা চলে। এই ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ ইসলাম ধর্মের মূল পাঁচটি 'চর্যা'র ইমান আল্লাহ ও পয়গম্বরে বিশ্বাস, নমাজ, রোজা, হজ (মক্কাদি তীর্থ দর্শন) ও জকাৎ (দান) সঙ্গে পরিচিত থাকলেও হিন্দুর কতকগুলি সংস্কার ছাড়তে পারেনি। ফলে খাঁটি ইসলামের অনুমোদিত অনেক প্রথা বাংলার মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল। হিন্দুর গুরুভক্তি ও গুরুবাদের অনুকরণে 'পঞ্চপীর'-এর, (যথা সত্যগীর, মানিকপীর, ঘোড়াপীর, কুম্ভীরপীর ও মদারীপীর) পূজা প্রচলিত হয়।

হিন্দু পুরোহিতের অনুকরণে মুসলমান গ্রামবাসীদের ধর্মকাজ পরিচালনার জন্য 'মোল্লা' শ্রেণির উত্তব হয়। হিন্দু সমাজের জাতিভেদের প্রভাবে মুসলমান সমাজেও বিভিন্ন শ্রেণির উদ্ভব হল- তুর্কি-পাঠান-মোগল প্রভৃতি জাতি ছাড়া সৈয়দ, আলিম, শেখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এর ফলে মুসলমান সমাজে উদ্ভব হয় উচ্চ ও নীচ সম্প্রদায়ের

অপেক্ষাকৃত নিচু শ্রেণির মুসলমানরা জোলা, মুকেরি, হাজাম, কসাই, দর্জি প্রভৃতি পদবি পায়।

কবিকঙ্কণ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গলকাব্যে 'কালকেতুর নগরপত্তন' অংশে ষোড়শ শতকে বাংলার মুসলমান সমাজের অবস্থানটি অনেকটাই জানা যায়।

ষোড়শ শতকের বাঙালির মুসলিম সমাজের পোশাক পরিচ্ছদ হল, সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সাদা জোব্বা পরতেন, তলদেশে কোমরে জড়ানো থাকতো কাপড়, কোমরের উপরে রেশমের কটিবন্ধ থেকে ঝুলত রৌপ্যখচিত সুদৃশ্য তরবারি। প্রত্যেক পুরুষের ছিল তিন, চার বা ততোধিক বেগম বা বিবি। রমণীদের পরিধেয় ছিল মূল্যবান বস্ত্র ও অলংকার। মেয়েরা ছিলেন পর্দানসীনা। বোরখা, নাকাব প্রভৃতি শরীর আচ্ছাদনের বহুল ব্যবহার ছিল।

মুসলমান সমাজে মাদ্রাসা-মক্তব প্রভৃতির মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। উচ্চ শিক্ষা সাধারণত ফারসি ভাষাতেই হত। কেউ কেউ আরবির চর্চা করতেন। শিক্ষা ছিল মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। কোরাণশরিফ, হাদিস্ প্রভৃতির পাঠ গ্রহণ করতে হত। শ্রীচৈতন্যের পূর্বকাল ও সমকালে বাংলাদেশের মুসলমানদের সংস্কৃতি ও ধর্মের চর্চাটি তুলে ধরা হল।

ষোড়শ শতকের হিন্দুসমাজের ধর্মসংস্কৃতি এবার আলোচনা করা যেতে পারে। হিন্দুসংস্কৃতি মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। মধ্যযুগে তার সাহিত্য-শিল্প-সমাজ প্রভৃতি ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। মৌলিক শাস্ত্রাদর্শগুলি মোটামুটি একরকম হলেও সমাজের প্রয়োজনে দেশ কালের পরিবর্তনে নবরূপ নিয়েছে। তাই বলা যায় হিন্দু ধর্ম রক্ষণশীল হলেও স্থিতিশীল নয়, গতিশীল। হিন্দুর ধর্মীয় সামাজিক সংস্কারগুলি বেদ এবং স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত হত। মধ্যবাংলায় হিন্দু সমাজ ছিল স্মৃতিশাস্ত নির্ভর। প্রাচীন গ্রন্থের নির্দেশগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে এ সময়ে নবোদ্ভূত আঞ্চলিক প্রথা, লোকাচার প্রভৃতি স্মার্ত অনুশাসনের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশেও মধ্যযুগে আচার্য শূলপাণি, রঘুনন্দন, গোবিন্দানন্দ প্রমুখ স্মার্ত পন্ডিতগণ সংস্কৃতে বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ক নিবন্ধ

রচনা করেন। সে সকল নিবন্ধ ছাড়াও বৃহদধর্ম পুরাণ, ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণ, তন্ত্রসার প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেও মধ্যযুগে বাংলার হিন্দুদের সমাজজীবন ও ধর্মজীবন চালিত হত।

বাঙালি হিন্দুজীবনে বারোমাসই পূজা-পার্বণ লেগে থাকত। বৈদিক যাগ-যজ্ঞ অপেক্ষা ব্রতানুষ্ঠানের আধিক্য ছিল বেশি। হিন্দুসমাজ বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। শৈব, শাক্ত, সৌরি, গাণপত্য, বৈষ্ণব, পাশুপত, পাঞ্চরাত্র, কাপালিক, কেলি, যোগী, নাথ প্রভৃতি। এদের মধ্যে প্রাধান্য ছিল শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবের। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব পূজাপার্বণ ও রীতি-নীতি ছিল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিষ্ণু-উপাসনায় রাধাকৃষ্ণের মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণবগণ গীতা, ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের অনুসরণ করতেন। ভাগবত ছিল ভক্ত বৈষ্ণবের নিত্যপাঠ্য পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

পূজা পার্বণের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল দুর্গাপূজা। স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী বিভিন্ন ব্রত ও দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল।

মধ্যযুগের বাংলায় লঘু গুরুভেদে পাপচারীকে সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে একঘরে করে রাখা হত। ব্রাহ্মণ সজ্ঞানে সুরাপান করলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হত। নর-হত্যাকারী অথবা হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মহাপাতকী বলে গণ্য করা হত।

মেয়েদের বিবাহের বিচিত্র নিয়ম ছিল। নয় বৎসরে গৌরীদানের ব্যবস্থা ছিল। সেন আমলের কৌলীন্য প্রভাব এযুগে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। কুলীনগণ প্রায়শই বহু বিবাহ করতেন।

খাদ্য ও পানীয় গ্রহণেও নানা বাছবিচার ছিল। পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের বাংলায় বিভিন্ন সংস্কার বা আচার অনুষ্ঠানের চল ছিল। যেমন গর্ভাধান, পুংসবন, সীমান্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ বিভিন্ন শুভকাজে হাঁচি-টিকটিকির বাধা মেনে চলা হত। নানা প্রকার লোকাচার ও স্ত্রীআচার পালন করা হত। বিবাহিত কন্যা পুত্রবতী না হওয়া পর্যন্ত কন্যার পিতা কন্যাগৃহে অন্নগ্রহণ করতেন না। একাদশীতে নিরম্বু উপবাসই ছিল যথাযথ নিয়ম।

শ্রীচেতন্যের আবির্ভাবের পূবেই হিন্দু সমাজে অবক্ষয়ের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর পূজার্চনা ছেড়ে অধিকাংশ লোক লৌকিক দেবদেবীর আশ্রয় নেয়। তার পরিচয় বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'–এ বর্তমান।

শ্রীচৈতন্যদেব বহু পুরাতন বৈষ্ণব ধর্মকে অভিনব বৈষ্ণবধর্মে রূপান্তরিত করলেন যার নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, এর প্রবর্তন খ্রিস্টীয় যোড়শ শতাব্দীতে। জ্ঞান-কর্ম ও ভক্তি- এই তিন মার্গের উপাসনা সুপ্রাচীনকাল থেকে মূলত বৈষ্ণব ধর্মে চলে আসছে। শ্রীচৈতন্য জ্ঞান ও কর্ম মার্গের তুলনায় ভক্তিবাদেরই প্রাধান্য দিলেন।

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য রাধাবাদের প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্মে কংসচাণুরমর্দন, যড়ৈশ্চর্যশালী আনন্দঘন বাসুদেব কৃষ্ণ বা বিষ্ণু উপাসনার চল ছিল।

যোড়শ শতকের আর একটি উল্লেখনীয় ঘটনা নবদ্বীপের পথে শ্রীচৈতন্য দলবলসহ হরিণাম সংকীর্তন করে বেড়াতে লাগলেন। এই হরিণাম সংকীর্তনকে কেন্দ্র করে মুসলমান শাসকদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধে। এবার তিনি গৃহত্যাগ করে সমগ্র দক্ষিণভারত, নীলাচল, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, গুজরাট, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে প্রেমধর্ম প্রচার করেন। জীবনের শেষ আঠারো বছর নীলাচলে অতিবাহিত করেন।

নীলাচলে শ্রীচেতন্য মহাপ্রভুর শেষ কয়েকটি বছর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটে। শ্রীচৈতন্য তাঁর জীবিতকালের মধ্যেই অবতার বা ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষরূপে বন্দিত হয়েছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁকে একই দেহে রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপ পূর্ণ ব্রহ্মনারায়ণ রূপে দেখেছেন।

শ্রীচেতন্য জীবনাদর্শ ও রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করে অনেক মুসলমান কবিও বৈষ্ণবকবিতা রচনা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবন সাধনায় হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে একটা আপাত সমন্বয় গড়ে উঠেছিল। নারায়ণ মনুষ্যদেহ ধারণ করে মর্তে এসেছেন- এই ধর্মীয় সংস্কার মানুষের মনে দৃঢ়মূল হল। এই পৃথিবী কেবল মায়ামাত্র নয়, ঈশ্বরের লীলাস্থলী- শ্রীচৈতন্যের জীবন সাধনায় নিপীড়িত, ভীরু, দুর্বল মানুষ তা আবার নতুন করে অনুভব করল | পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে এল। কলিযুগেই তা সম্ভব হল বলে ভক্ত বৈষ্ণব যুগবন্দনায়

বলেছেন- 'প্রণমহ্যে কলিযুগ সর্বযুগ সার' জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে এই ইতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গীই বাঙালির সংস্কৃতিক জীবনে শ্রেষ্ঠ অবদান। কল্যাণীশঙ্কর ঘটক মন্তব্য করেছেন- "বিনয়, নম্রতা, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি তাঁর প্রদর্শিত সদ্‌গুণাবলী জ্ঞাত অজ্ঞাতসারেই বাংলা সাহিত্যের সকল শাখায় সঞ্চারিত হয়েছিল। চেতনাহীন মানুষের চেতনা সঞ্চারে বাঙালির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে কতগুলি ধ্রুব আদর্শের দীপদান তিনি উপহার দিয়েছিলেন।"

৮.৬। অনুশীলনী

১। কোনো গ্রন্থ পাঠ করার ক্ষেত্রে স্থান কালের প্রেক্ষিতটি আলোচনার গুরুত্ব বিচার করুন।

২। ষোড়শ শতকের বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি আলোচনা করুন।

৩। ষোড়শ শতকের বাংলার আর্থসামাজিক চালচিত্র আলোচনা করুন।

৪। ষোড়শ শতকের বাংলার (রাঢ় বাংলার) সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় চালচিত্র আলোচনা করুন।

৫। ষোড়শ শতকের রাঢ়বঙ্গের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক চিত্রটি উপস্থাপিত করুন।

৬। ষোড়শ শতকের চৈতন্য পরবর্তীকালের গৌড়বঙ্গে ও রাঢ়বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসটি আলোচনা করুন।

৮.৭। গ্রন্থপঞ্জি

১। গোবিন্দদাসের পদাবলী : বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

২। পাঁচশত বৎসরের পদাবলী : বিমান বিহারী মজুমদার

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১-৩ খন্ড) : ড.অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। বৈষ্ণব পদাবলী : ড. সত্য গিরি

৫। বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় নবপর্যায় : নীলরতন সেন

মন্তব্য

৬। বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস (২-৩ খন্ড) : ড. সুকুমার সেন

একক: ৯ : কবি পরিচয় ও পদ বিশ্লেষণ

বিন্যাসক্রম

৯.১। গোবিন্দদাসের পরিচয়

৯.২। গোবিন্দদাস: নাম সমস্যা তথা একাধিক গোবিন্দদাস প্রসঙ্গ

৯.৩। পূর্বরাগের পদে গোবিন্দদাস

৯.৪। অনুরাগের পদে গোবিন্দদাস

৯.৫। অভিসারের পদে শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দ দাস

৯.৬। মানের পদে গোবিন্দদাস

৯.৭। কলহান্তরিতা পদে গোবিন্দদাস

৯.৮। মাথুর পদে গোবিন্দ দাস

৯.৯। মিলনের পদে গোবিন্দদাস

৯.১০। রাসলীলার পদে গোবিন্দদাস

৯.১১। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দ দাস

৯.১২। অনুশীলনী

৯.১৩। গ্রন্থপঞ্জি

৯.১। গোবিন্দদাসের পরিচয়

গোবিন্দদাস মধ্যযুগীয় সাহিত্যের এক ভাস্বর প্রতিভা। রাধাকৃষ্ণলীলা নিয়ে রচিত তাঁর পদাবলীর বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী কবিদের ধারানুবর্তী। কিন্তু অলংকার ব্যবহারে, মণ্ডনকলা নৈপুণ্যে অপূর্ব ছন্দঝকারে এবং শব্দ ব্যবহারের সুমিত কুশলতায় গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির সার্থক উত্তরসূরি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে সুপরিপক্ক জ্ঞান এবং গভীর ভক্তির মার্জিত দ্যুতিতে তাঁর পদাবলীর মধ্যে এক ধরনের কঠিন সুসংবদ্ধ ক্লাসিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। তাঁর এই কবিপ্রতিভা বহু বৈষ্ণব মহাজনের স্বীকৃতিতে ও সপ্রশংস উল্লেখে ধন্য। বল্লভদাসের বর্ণনায় গোবিন্দদাসের 'কাব্যরস অমৃতের খনি'। তিনি 'অলৌকিক কবি শিরোমণি'। বল্লভদাসই গোবিন্দদাসকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' বলে অভিহিত করেছেন। গোবিন্দদাসের মৃত্যুর শতবর্ষ পরে নরহরি চক্রবর্তী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন গোবিন্দদাসের 'পরম বিচিত্র কাব্যবিন্যাস', 'তিখিন বাণ সম বেধই হিয় শির'। রাধামোহন ঠাকুরও তঁর পদমৃতসমুদ্রের মঙ্গলাচরণে যে সাতজনকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিরূপে বন্দনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন গোবিন্দদাস। চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবিদের মধ্যে তিনি একমাত্র গোবিন্দদাসের নামই করেছেন। শ্রীজীব গোস্বামীও গোবিন্দদাসকে লেখা তাঁর ব্যক্তিগত পত্রে গোবিন্দদাসের কবিত্বের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এসব উল্লেখ একজন উচ্চকোটির বৈষ্ণব সাধকের প্রতি অপর বৈষ্ণবজনের স্বীকৃতি মাত্রটুকু যে নয় তা আধুনিক কাব্যরসিকের আলোচনায়ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কালিদাস রায়ের মতে 'গোবিদ্দদাসের মত শ্রেষ্ঠ কবি শুধু বাঙ্গালায় কেন, ভারতবর্ষেও দুর্লভ!' আর অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুও গোবিন্দদাসকে 'সৌন্দর্যের কবি' হিসেবেই অভিনন্দিত করেছেন।

গোবিন্দদাস যোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জন্মেছিলেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন, চল্লিশ বছর বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাসের কাছে পদ রচনার অনুমতি চাইলে, তিনি তাঁকে রুপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি পাঠ করার পরামর্শ দেন। সংস্কৃত সাহিত্যে বিদগ্ধ গোবিন্দদাস বৈষ্ণব দর্শন ও রসশাস্ত্র বিষয়ে পর্যাপ্ত পাঠ গ্রহণ করে পদাবলী রচনায় হাত দেন।

৯.২। গোবিন্দদাস: নাম সমস্যা তথা একাধিক গোবিন্দদাস প্রসঙ্গ

ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণব পদ-রচয়িতা বাঙালী কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব একবাক্যে স্বীকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্যে কবিদের নামসাদৃশ্য এত বেশি লক্ষ্য করা যায় যে কোন নির্দিষ্ট কবিকে পৃথকরুপে চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বৈষ্ণব কবিতার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস এবং জ্ঞানদাসকে নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, গোবিন্দদাসকে নিয়েও আমাদের অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। শুধু যোড়শ শতাব্দীতেই 'গোবিন্দ' নামধারী অন্তত ৪ জন বৈষ্ণব কবির সন্ধান পাওয়া যায়। চৈতন্যপার্ষদগোষ্ঠীর অন্তর্গত গেবিন্দ আচার্য এবং গোবিন্দ ঘোষও পদ রচনা করতেন। এ ছাড়া ছিলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ যিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনার সামর্থ্যে বিদ্যাপতির সমকক্ষতা দাবী করতে পারেন। 'গোবিন্দদাস' ভনিতায় বাঙলা ভাষায় পদ পাওয়া যায়- এদের সঙ্গে গোবিন্দদাস কবিরাজের কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানা সম্ভব নয়। এই চারজন গোবিন্দদাসের রচনার জট পাকিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়- কোন এক গোবিন্দদাসের সমস্ত রচনা সুনির্দিষ্টভাবে অপর সকল গোবিন্দদাসের রচনা থেকে পৃথক করে নেওয়া বোধ হয় এখন অসম্ভবই।

গোবিন্দদাসের পদে বিদ্যাপতির ভাষার ঐশ্বর্য ও ছন্দের কারুকাজ লক্ষিত হয়। গোবিন্দ ঘোষ ও গোবিন্দ চক্তবর্তীর মধ্যে গোবিন্দ চক্রবর্তী ছিলেন গোবিন্দদাসের গুরুভাই। তিনিও গোবিন্দদাসের মতো ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন। বিমানবিহারী মজুমদার গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাঁর যুগে গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদের সংখ্যা ধরেছেন ২৪। গোবিন্দদাসের ব্রজবুলিবিষয়ক পদ এতই প্রোজ্জ্বল যে তা চিনতে সঙ্কলকের অসুবিধা হয় নি। বিমানবিহারী মজুমদার অবশ্য গোবিন্দদাসের বাংলা পদের সংখ্যা ২০-২২। তবে ব্রজবুলিতিই গোবিন্দদাস যেন বৈষ্ণব পদের স্থপতি।

৯.৩। পূর্বরাগের পদে গোবিন্দদাস

পূর্বরাগ পর্যায়ে গোবিন্দদাস শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ- উভয়েরই পূর্বরাগ বর্ণনা করেছেন।

'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি'

শীর্ষক পদটিতে কৃষ্ণের রূপদর্শনে রাধার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণের তরুণ দেহের লাবণ্য যেন সারা পৃথিবীকে প্লাবিত করে প্রবাহিত হচ্ছে। গোবিন্দদাস রূপদক্ষ, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ আবেদন-নির্ভর কবি। কিন্তু এই একটি পংক্তিতে তিনিও রোমান্টিক। কৃষ্ণরূপের সমুদ্রে জ্ঞানদাসের রাধার দুটি চোখ ডুবে যায়। আর গোবিন্দদাসের কৃষ্ণের লাবণ্য নদীর স্রোতের মতো গতিময় প্রবাহ রাধার পৃথিবীকে প্লাবিত করে। কৃষ্ণের ঈষৎ মধুর হাসি যেন এই রূপে তরঙ্গ তোলে । আর সেই হাসির সৌন্দর্যে মদনও মূর্ছিত হয়। কৃষ্ণের এই রূপ দেখে রাধার ধৈর্য দূরে গেল। তাঁর মন সর্বদাই কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল। কৃষ্ণের রূপ, ভঙ্গি এবং প্রসাধন রাধাকে ব্যাকুল করে তোলে। তখন কৃষ্ণকে না দেখার কষ্ট ব্যাধির মতো রাধাকে আচ্ছন্ন করে। পদটি প্রৌঢ় পূর্বরাগের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। শ্রীরূপ গোস্বামী পূর্বরাগেও নায়ক-নায়িকার দশটি দশার কথা বলেছেন। এই পদে কৃষ্ণবূপ দর্শনে রাধার লালসা, উদ্বেগ, ব্যাধিগ্রস্ততা, উন্মাদ এবং মৃত্যুর আশঙ্কা বা মূর্তি- এই বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে আবার পদটি নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তনরত মূর্তির কথাও মনে করিয়ে দেয়।

'রূপে ভরল দিঠি'

শীর্ষক পদটিতে রাধার কৃষ্ণানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। রাধা তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে কৃষ্ণপ্রেমের প্রাবল্যকে নিজের মধ্যে অনুভব করেছেন। তাঁর দৃষ্টি, তাঁর স্পর্শেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়- সবই কৃষ্ণময়। কৃষ্ণের অনুরাগেই রাধার শরীর এবং মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণের নতুন নতুন গুণও রাধার মনকে বেঁধে ফেলেছে। ধর্ম পড়ে আছে কেমন দূরে । গোটা পদটিতে রাধার কৃষ্ণরূপ দর্শনের আনন্দ, তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহের উল্লাস স্বতঃস্ফূর্ত গৌরবে প্রকাশিত। দ্বিধা-লজ্জা-সঙ্কোচহীন এই আনন্দ ঘোষণা একদিকে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষকে প্রকাশ করেছে, অন্যদিকে তত্ত্বাংশকে বাদ দিয়ে এটিকে এক মত্যমানবীর প্রেম-স্ফুরণের অকুণ্ঠ ঘোষণারূপেও গ্রহণ করা যায়। 'যাঁহা যঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।

তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি।।

যাঁহা যাঁহা অরুণ চল চলই।

তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই।।'

শীর্ষক পদটি কৃষ্ণের পূর্বরাগের। কৃষ্ণ বলছেন, তন্বী রাধার দেহজ্যোতি যেখানে যেখানে প্রকাশিত হচ্ছে, সেই সেই জায়গায় যেন বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে। তাঁর রক্তাভ চরণ যেখানে প্রকাশিত হচ্ছে, সেখানেই ঝড়ে পড়ছে স্থলকমল। রাধার চঞ্চল ভ্রূ-ভঙ্গিতে যমুনা-তরঙ্গের সৌন্দর্য। তাঁর চোখের দৃষ্টি যে যে জায়গায় গিয়ে পড়ছে সেই সেই জায়গা যেন নীল পদ্মে ভরে উঠছে। রাধার মধুর হাসি ফুটিয়ে তুলছে কুন্দ-কুমুদ। বিদ্যাপতির 'যঁহা যঁহা পদজুগ ধরই' শীর্ষক পদটির প্রত্যক্ষ প্রভাবে এই পদটি রচিত। কিন্তু বিদ্যাপতির কৃষ্ণ আবার কিভাবে রাধার দেখা পাবেন, এই চিন্তায় ব্যাকুল হয়েছেন। আর গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ বলছেন, রাধা যেন তাঁর প্রাণ নিয়েই খেলা করছেন। বিদ্যাপতির কৃষ্ণের মধ্যে কেবলমাত্র রূপমুগ্ধতা, আর গোবিন্দদাসের পদে তারও অতিরিক্ত আছে আর্তব্যাকুলতা। বিদ্যাপতির নায়িকা নাগরিকা-নায়িকা, তাই তার 'কুটিল কটাখ'। আর গোবিন্দদাসের রাধা মহাভাবময়ী, তাই তাঁর 'তরল বিলোকন'। বিদ্যাপতির রাধার কুটিল কটাক্ষে লক্ষ লক্ষ মদনের শর নিক্ষিপ্ত হয়, আর গোবিন্দদাসের রাধার তরল বিলোকনে নীলোৎপলের অরণ্য জেগে ওঠে। একটিতে কামনার মদিরতা, অন্যটিতে পূজাপুষ্পের শুচিস্নিগ্ধতা।

৯.৪। অনুরাগের পদে গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাসের রূপানুরাগের পদ তাঁর স্বাভাবিক ভক্তিপ্রাণতার একটি দিককে প্রকাশ করেছে। জ্ঞানদাস রূপানুরাগ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তাঁর সঙ্গে গোবিন্দদাসের পার্থক্য হল- জ্ঞানদাস রূপ বর্ণনায় নিজের অনুভূতিকে অনেকখানি মিশিয়ে ফেলেন। আর গোবিন্দদাস নিজেকে দূরে রেখে রূপকে যেমন যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলেন, তেমনিভাবেই রূপের প্রতি অনুরাগও বর্ণনা করেন। ভক্তশিল্পী যেমন শ্রদ্ধা নিয়ে তিল তিল করে দেবতার মূর্তি গড়ে তোলেন, গোবিন্দদাসও সেই শ্রদ্ধা নিয়ে রূপ নির্মাণ করেছেন।

গোবিন্দদাসের রাধাও প্রথম দর্শনেই কৃষ্ণের রূপে আত্মবিস্মৃত। কিন্তু এই আত্মবিস্মৃতি জ্ঞানদাসের রাধার মতো অনির্দেশ্য নয়। 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি' শীর্ষক পদটি রাধার রূপানুরাগের পদ। রাধা দেখেছেন, তরুণ অঙ্গের লাবণ্য যেন সারা পৃথিবীকে প্লাবিত করছে। তাঁর অধরের ঈষৎ হাসির হিল্লোলে মদনও যেন মৃত হয়ে পড়েন। রাধা বলছেন, এই প্রেমিককে তিনি কোন্ মুহূর্তে দেখেছিলেন তা তিনি জানেন না। কিন্তু দর্শনের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর ধৈর্য দূর হয়ে গেল। মন সর্বদাই ব্যাকুল ও কাতর। কৃষ্ণ হাসতে হাসতে, নৃত্য করতে করতে অঙ্গ দুলিয়ে যান, আর তাঁর কটাক্ষের তীক্ষ্ণ তীর যেন রাধার প্রাণ বধ করতেই নিক্ষিপ্ত হয়। কৃষ্ণের গলার মালতিমালাটি তাঁর বুকের মাঝখানে দোলে। মত্ত ভ্রমর তারই আশপাশে ঘুরে বেড়ায়। কৃষ্ণের কপালের চন্দন তিলকের আভা রাধার হৃদয়কে বিশুদ্ধ করে। কৃষ্ণকে দেখার পর রাধার মনে কি ব্যাধি যে দেখা দিয়েছে, লোকলজ্জায় তা বলতে পারেন না। কিন্তু এত কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও নারীর কঠিন প্রাণ বেঁচে থাকে। কৃষ্ণরূপমুগ্ধা রাধার এই আর্তব্যাকুলতা কবি গোবিন্দদাসকেও যেন চিন্তিত করে তোলে। শেষ পর্যন্ত রাধার কি হবে ভেবে তিনি আশঙ্কা বোধ করেন। পদটিতে রূপানুভবের মানসিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে নায়ক সম্পর্কে কবির গর্ববোধ যুক্ত হয়ে তাঁর ভাষাকে এমন আবেগময় করে তুলেছে। তরুণ দেহের 'ঢল ঢল' অঙ্গ লাবণ্য, ঈষৎ হাসি, অঙ্গের দোলন আর মনমোহন তরল কটাক্ষ- এ সবই কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণচৈতন্য উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। তাই পদটি শুধু রাধার রূপানুরাগের নয়, গোবিন্দদাসের রূপানুরাগেরও বটে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এখানেও গোবিন্দদাস রূপানুরক্ত, রূপের প্রভাবে আত্মবিস্মৃত নন।

গোবিন্দদাসের রূপানুরাগের আর একটি পদে রাধা বলেন যে, কৃষ্ণের রূপে তাঁর দুচোখ ভরে যায়। সেই রূপ ছাড়া তিনি আর কিছুই দেখতে পান না। তাঁর সুমিষ্ট স্পর্শের কথা মনে করে রাধার দেহ পুলকিত হয়। সেই পুলকের প্রকাশ ঘটে অবিরল রোমাঞ্চে। কৃষ্ণের মোহনমুরলী রবে রাধার শ্রবণ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তিনি আর অন্য কিছুই শুনতে পান না। সখি উপদেশ দিতে এলে রাধা বলেন, 'কানু অনুরাগে' তাঁর 'তনু-মন' মত্ত হয়ে উঠেছে। কুলধর্ম লোপ পাওয়ার ভয়ও তাঁর মনে আর বিন্দুমাত্র নেই। তাঁর নাসিকায়

কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধই লেগে আছে। তাতেই সে উন্মত্ত। মুখও আর অন্য নাম নেয় না। শ্রীকৃষ্ণেল নতুন নতুন গুণসমূহ রাধার মনকে বেঁধে ফেলেছে। সেখানে নারীধর্মের থাকার আর কোনও জায়গা নেই। গৃহস্বামীর তর্জন, গুরুজনের গর্জন শুনেও রাধার হাসি পায়। কোনও সমালোচকের মতে, রাধার রূপানুরাগ বর্ণনার তুলনায় কৃষ্ণের রূপানুরাগ বর্ণনাতেই কবি অনেক বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। একথা মেনে নিয়েও বলা যায়, রাধার রূপানুরাগ বর্ণনায়ও গোবিন্দদাসের সিদ্ধি তর্কাতীত। গোটা পদটিতে রাধার কৃষ্ণরূপ দর্শনের আনন্দ, তাঁর ইন্দিয়সমূহের উল্লাস স্বতস্ফূর্ত গৌরবে প্রকাশিত। দ্বিধা-লজ্জা-সংকোচহীন এই আনন্দ-ঘোষণায় একদিকে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ, অন্যদিকে এক মর্ত্যমানবীর প্রেম-স্ফূরণের অকুণ্ঠ ঘোষণাও উচ্চারিত।

৯.৫। অভিসারের পদে শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দ দাস

অভিসার পর্যায়ে গোবিন্দদাস অবিসংবাদীভাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। অভিসারের মধ্যে যে বিপুল গতির আবেগ, অতন্দ্র নিষ্ঠা ও দুরূহকে, দুগমকে উত্তীর্ণ হওয়ার অভীপ্সা, গোবিন্দদাসের অভিসার-বিষয়ক পদে তাঁর পরিপূর্ণ প্রকাশ। এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যাপতির পদেও আছে। তাঁর মানবী রাধাও প্রেমসাধনার গৌরবে, দুর্গমকে জয় করার অসাধারণ ক্ষমতায় শেষপর্যন্ত আলোকসামান্যা। কিন্তু গোবিন্দদাসের মতো এতখানি পরিবেশ বৈচিত্র্য, পারম্পর্যময়, নাটকীয়তা বিদ্যাপতির পদে নেই। আর অন্যান্য কবিগণ এই পর্যায়ের পদে গোবিন্দদাসের কাছাকাছিও আসতে পারেন না। শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি-তে অভিসারের যে বিভিন্ন প্রকার ও প্রকরণ রয়েছে, গোবিন্দদাস তা বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ভক্ত এবং কবি হিসেবে তাঁর সব থেকে বড় কৃতিত্ব সম্ভবত এইখানেই যে অভিসারের কোনও দিনক্ষণ নেই। প্রাণের আবেগ অসময়কেও সময় করে তোলে। এই সাধারণ সত্যকে তিনি সামাজিকের মনেও সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। তাঁর রাধা প্রথম যখন অভিসারের পথে নামেন, তখন তিনি রূপে রসে প্রসাধনে অনুপমা। তিনি "কুঞ্চিতকেশিনী", "নিরুপমবেশিনী", "রসআবেশিনী"। ব্রজরমণীগণের "মুকুটমণি", "কুঞ্জরগামিনী" এই নারীর রূপের জ্যোতিতে যেন বিজলী চমকায়। তিনি শ্যামের 'হৃদয়বিহারিণী', আবার 'অখিল সোহাগিনী'ও বটে। এই রাধা

যিনি সৌন্দর্যে ও গুণে সর্বশ্রেষ্ঠা, প্রতিকূল পরিবেশে তাঁরই দুর্গম পথাতিক্রমণের বর্ণনায় কবি গোবিন্দদাস শুধু চিত্র আর ধ্বনি নয়, নাটকীয়তারও সৃষ্টি করেছেন।

গোবিন্দদাসের রাধা কৃষ্ণাভিসারে যাওয়ার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

'কণ্টকগাড়ী কমলসম পদতল'

শীর্ষক পদটিতে রাধার সেই অতন্দ্র সাধনার চিত্রই ফুটে উঠেছে। তিনি পায়ের নূপুরে কাপড় বেঁধে, কলসের জল ঢেলে, প্রাঙ্গণ পিচ্ছিল করে, পায়ের আঙুল টিপে টিপে দুর্গম পথে চলার অভ্যাস করেন। রাধার অভিসারের পথ অন্ধকার । তাই হাত দিয়ে চোখ আবৃত করে অন্ধকারে পথ চলার অভ্যাস করেন রাধা । পথে সাপের ভয়। তাই নিজের কঙ্কন মূল্য হিসেবে দিয়ে সাপের মুখ বাঁধার কৌশল শিক্ষা করেন। গুরুজনদের কথা তিনি কানে শুনতেই পান না। আর পরিজনদের কথা শুনে বোকার মতো হাসেন। রাধার এই দুশ্চর তপস্যা কুমারসম্ভবের তাপসী উমার কথাই মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু উমার তপস্যা যত দুশ্চরই হোক না কেন, তপস্যার শেষে স্বয়ং চন্দ্রশেখরই তাঁর কাছে এসেছিলেন। আর গোবিন্দদাসের রাধাকে দুর্গম পথ অতিক্রম করা যেতে হবে দয়িতের কাছে। গোবিন্দদাসের এই পদটি কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের একটি শ্লোকের ভাব অবলম্বন করেছে- "মার্গে পঙ্কিনি তোয়দান্ধতমসে নিঃশব্দসংচারকং গন্তব্য দয়িতস্য মেহদা বসতিমুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম। আজানুদ্ধৃত নূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং কৃচ্ছ্রাল্লব্বপদস্থিতিঃ স্বভনে পন্থানমভাস্যতি।" পঙ্কিল পথে মেঘান্ধতমসার ভেতর দিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আজ আমাকে প্রিয়ের বাসভবনে যেতে হবে। এই ভেবে এক মুদ্ধা রমণী নূপুরকে জানু পর্যন্ত তুলে নয়ন দুটিকে করতলে আবৃত করে অতি কষ্টে পদস্থিতি লাভ করে নিজের ঘরেই পথচলার অভ্যাস করছে। গোবিন্দদাস কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের অনুসরণে পদটি রচনা করলেও কিছুটা স্বাতন্ত্র্য গ্রহণ করেছেন। কারণ কণ্টকাকীর্ণ সর্পময় পথে চলার এমন পূর্বপ্রস্তুতির বর্ণনা মূল শ্লোকে নেই। নারীর সর্বাধিক প্রিয় অলংকারের বিনিময়ে সর্প মুখ বন্ধনশিক্ষাও মূল শ্লোকে নেই। বিদ্যাপতির একটি পদে আছে-

'দেখি ভবনভিতি লিখল ভুজগপতি

জসু মনে পরম তরাসে ।

সো সুবদনী করে ঝপইত ফণীমণি

বিহুসি আইলি তুঅ পাশে।।'

গোবিন্দদাস এই পদটির দ্বারাও কিছুটা প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু রাধার দুর্গম পথযাত্রার বর্ণনায় কবি ঈশ্বর সাধনার দুর্গম পথের ব্যঞ্জনাই ফুটিয়ে তুলেছেন- "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" রাধার এই সাধনা গীতার অভ্যাস যোগের কথাও মনে করিয়ে দেয়। সর্বোপরি গোটা পদটিতে আছে ছন্দের ও শব্দের হিল্লোলে জীবন্ত হয়ে ওঠা অভিসার প্রস্তুতির নাটকীয় চিত্র। ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করে নিয়েও সেই ঐতিহ্য থেকে উত্তরণের উজ্জ্বল সিদ্ধি এই পদটিতে গোবিন্দদাসের করায়ত্ত।

বর্ষাভিসারেই অভিসারিকা রাধার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা, প্রকৃতির প্রতিকলতা তখন সবচেয়ে তীব্র। 'মন্দির বাহির কঠিন কপাট'শীর্ষক পদটিতে রাধার সখী বাইরের প্রকৃতির প্রতিকূলতার সঙ্গে গৃহপরিবেশেরও প্রতিকূলতার উল্লেখ করে দুঃসাধ্য অভিসার যাত্রা থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন। সখী বলছেন ঘরের বাইরে সুদৃঢ় কপাট, সুতরাং বাইরে যাওয়ার পথ বন্ধ। কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ অত্যন্ত দুর্গম। তার ওপর বৃষ্টি হচ্ছে মুলধারে। রাধার নীল শাড়ি এই প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে যাবে। এর মধ্যে তিনি কি করে অভিসার করবেন? কৃষ্ণ আছেন বন্ধুরে মানস-গঙ্গার পারে। চতুর্দিকে ঘন ঘন বজ্রপাতের তুমুল শব্দ। বিদ্যুতের তীব্রদীপ্তি চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। এসব জেনেও যদি রাধা অভিসারে বেরিয়ে পড়েন তাহলে বলতে হয়, প্রেমের জন্য তিনি দেহকে উপেক্ষা করবেন। ভণিতায় গোবিন্দদাস সখীকে নয়, শ্রীরাধাকেই সমর্থন করেছেন। জ্যা-নির্গত তীরকে যেমন ফেরানো যায় না, অভিসারসংকল্পা রাধাকেও তেমনি নিবৃত্ত করা যাবে না। অভিসারের বর্ষণমুখর পটভূমি রচনায় এক বিদ্যাপতি ছাড়া গোবিন্দদাসের সমতুল্য আর কেউ নেই। রাধার অভিসার তো প্রেম-তপস্যা। সেই তপস্যার পথ কত দুর্গম, সিদ্ধি কত দুর্লভ, বিঘ্ন-বিপদ ও বাধা কত দুস্তর- তারই পরিচয় এই পদটিতে পাওয়া যাচ্ছে। রাধার এই প্রেমতপস্যার পথে শুধু সমাজ বা সংস্কারের বাধাই বড় বাধা নয়,

বিশ্বপ্রকৃতিও প্রবলভাবে বিমুখ। গোবিন্দদাস এই পদে রাধার অভিসারের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করার জন্যই যেন বিরূপ বিশ্বপ্রকৃতির পরিব্যাপ্ত চিত্র এঁকেছেন। বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রি শব্দ এবং ধ্বনিতে, ছন্দের হিল্লোলে যেন সজীব প্রাণময় হয়ে উঠেছে। নিজের অভীষ্টকে, ইপ্সিতকে লাভ করার জন্য প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক ইতিহাস মানবসভ্যতারই ইতিহাস। সেই প্রকৃতি জড়। আর এখানে, এই পদে প্রকৃতিও একটি জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। রাধার বিশুদ্ধ প্রেমকে যাচাই করার কষ্টিপাথর সে। আর গোবিন্দদাসের ভণিতাই বলে দিচ্ছে, প্রকৃতির পরীক্ষা যত দুরূহই হোক না কেন, রাধা তাকে অতিক্রম করবেনই।

পরবর্তী বর্ষাভিসারের পদটি সখীর নিষেধে রাধার উত্তর-

'কুল মরিযাদ কপাট উদঘাটলুঁ'

শীর্ষক এই পদটিতে রাধা বলছেন যে, কুলমর্যাদার দরজা যখন তিনি খুলেই ফেলেছেন, তখন সামান্য কাঠের দরজা আর তাঁকে কি বাধা দেবে? আত্মসম্মানরূপ সমুদ্র তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাই নদীর অগাধ জলও তিনি অনায়াসে অতিক্রম করতে পারবেন। সখী যেন আর তাঁকে পরীক্ষা না করেন। কৃষ্ণ রাধার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করে আছেন, একথা ভেবেই রাধার দুচোখ দিয়ে জল পড়ছে। সখী বলেছিলেন, রাধার নীল নিচোল বৃষ্টিতে ভিজে যাবে। কিন্তু প্রেমের দেবতা যার ওপর কোটি কোটি বাণ বর্ষণ করছেন, মেঘের জল তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। প্রেমের আগুন যার হৃদয়ে জ্বলছে বজ্রাগ্নি তাকে দগ্ধ করতে পারে না। তাছাড়া রাধা তো নিজের জীবনই কৃষ্ণের কাছে সমর্পণ করেছেন। তাই কৃষ্ণের জন্য যদি তার শরীরই ত্যাগ করতে হয়, তবে তা রাধার পক্ষে দুঃসাধ্য হবে না। ভণিতায় গোবিন্দদাস রাধাকে অভিসারে উৎসাহিত করে বললেন, এবার সখী রাধার দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা বুঝতে পেরেছেন। পদটি গোবিন্দদাসের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ অভিসার পদের অন্যতম। রাধার কৃষ্ণপ্রেম এখানে তাঁকে প্রবল ও প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রেরণা যুগিয়েছে। বাইরের বাধা যত বড়ই হোক না কেন, অন্তরের বাধা তার চেয়ে প্রবল। সেই বাধাকে অতিক্রম করতে পারলে বাইরের প্রবল বাধাকে অতিক্রম করা যায়। রাধা এই সত্যকেই প্রমাণ করেছেন। তার অন্তরে আছে প্রতীক্ষমাণ

প্রেমিক কৃষ্ণের মূর্তি। সেই প্রতীক্ষার মধ্যে যে আন্তরিক ব্যাকুলতার আকর্ষণ, তারই টানে রাধার এই দুর্গম পথযাত্রার সুদৃঢ় ঘোষণা। গোবিন্দদাসের অভিসারের পদে বিঘ্ন-বিজয়িনী রাধার প্রেম-তপস্যার চূড়ান্ত চিত্রণ এই পদটিতে লক্ষ্য করা যায়।

শুধু অভিসার যাত্রার বর্ণনা নয়, অভিসার যাত্রার সমাপ্তি বর্ণনাতেও গোবিন্দদাস অতুলনীয়। তাঁর

'আদরে আগুসারি'

শীর্ষক পদটিতে অভিসার যাত্রার সমাপ্তিতে রাধা কৃষ্ণের কাছে পৌঁছলে কৃষ্ণেরই প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। যাঁর জন্য রাধা এত দুর্গম পথ অতিক্রম করে অভিসারে আসেন, সেই প্রেমময় কৃষ্ণও এগিয়ে এসে সাদরে রাধাকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর জানুর ওপরে রাধাকে বসিয়ে কৃষ্ণ নিজের পদ্মের মতো দুটি হাত দিয়ে রাধার অভিসার ক্লান্ত দুটি পা মুছে দিলেন এবং সেই পায়ের দিকে অনুরাগ ভরে তাকিয়ে রইলেন। যিনি স্বয়ং প্রেমের মূর্তিমান দেবতা, যাঁকে দর্শন করেই রাধার সমস্ত দুঃখ ঘুচে গেছে, তিনি নিজেই রাধার চরণ-সেবা করছেন। চন্দ্রকিরণে শীতল জলে হাত ভিজিয়ে সেই হাত দিয়ে কৃষ্ণ রাধার মুখ মার্জনা করলেন। সজল পদ্মদলে রাধাকে মৃদু বীজন করতে করতে কৃষ্ণ পথের কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর রাধার চিবুক আঙুলে তুলে ধরে তাঁর অধরে তাম্বুল দিলেন এবং মধুর ভাষায় সম্ভাষণ করলেন। গোবিন্দদাস ভণিতায় বলছেন, কৃষ্ণের এই সানুরাগ সেবা যেন রাধাকে নিত্যনতুন অমৃতের ধারায় স্নান করাল। এই পদটিতে অভিসারিকা রাধার কৃচ্ছ্রসাধন কৃষ্ণের স্বীকৃতিতে কিভাবে ধন্য হয়েছে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দে মিলনের পর স্বাধীন ভর্তৃকা নায়িকা নায়ককে আদেশ করেন ভূষণে-প্রসাধনে সাজিয়ে দেওয়ার জন্য এবং নায়কও নায়িকার আজ্ঞা পালন করেন। এটি সুদক্ষিণ নায়কের লক্ষণ। কিন্তু অভিসার যাত্রার শেষে এই প্রেম-স্নিগ্ধ সেবাময় নায়কের চিত্র সমগ্র বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যেই বিরল দৃষ্ট।

গোবিন্দদাসের রাধা কৃষ্ণের জন্য যতটুকু কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন, সে জন্য নিজের প্রশংসা নিজে করতে মোটেই কুণ্ঠিত নন।

'মাধব কি কহব দৈব বিপাক'

শীর্ষক পদটিতে অভিসার যাত্রার শেষে কৃষ্ণর কাছে উপনীতা রাধা নিজের দুর্গম পথ যাত্রার বিবরণ দিয়েছেন। মাধবকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন, পথের দুর্দশার কথা তিনি আর কি বলবেন। যদি লক্ষ লক্ষ মুখ হয় তা হলেও পথযাত্রার কথা বলে শেষ করা যাবে না। গৃহবহির্গতা রাধা দু-চার পা এগিয়ে যাওয়ার পরই অন্ধকার রাত্রি দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। অন্ধকার এত নিবিড় যে রাধা পথও দেখতে পাচ্ছিলেন না। তার ওপর আবার তাঁর দুটি পায়েই সাপ জড়িয়ে ধরল। রাধা একে কুলনারী অর্থাৎ সাধারণভাবেই পথচলার অভ্যাস তাঁর নেই। তার ওপর অমাবস্যার ঘন অন্ধকার রাত্রি। গন্তব্যও বহুদূর । এরও সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রবল বর্ষণ। অথচ রাধাকে তো যেতে হবে অনেক দূরে। তাঁর পদ্মের মতো কোমল সুন্দর দুটি পা কর্দমলিপ্ত হল। পায়ের কাঁটার আঘাতেও যন্ত্রণা পেল। কিন্তু তীব্র কৃষ্ণদর্শন লালসায় রাধা কিছুই টের পেলেন না। এখন কৃষ্ণের দেখা পেয়ে তাঁর সমস্ত দুঃখই দূর হল। যেদিন রাধার কানে কৃষ্ণের বাঁশির সুর এসে প্রবেশ করেছে, সেদিনই গৃহের সুখ পাওয়ার আশা রাধা ত্যাগ করেছেন। পথের দুঃখ তাঁর কাছে তৃণের চেয়ে তুচ্ছ মনে হয়েছে। উপনীত-সিদ্ধি রাধিকার এই পথাতিক্রমণ বর্ণনাকে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু রসোদ্গারের মতো অভিসারোদ্গার বলেছেন। আমরা তাঁর সঙ্গে এক মত। পদটির অসাধারণ ভাবগৌরব, শব্দ দিয়ে ছবি আঁকার কুশলতা, নাটকীয় গতিবেগ এবং মহাভাবময়ী রাধার দিব্য অনুভূতির আলোক সহৃদয়ের মনকে মুহূর্তে অধিকার করে নেয়। গোবিন্দদাসের অভিসারিকা রাধার এই প্রেম আত্মসমর্পণে ধন্য। কিন্তু নিজের কৃতিত্ব সম্পর্কেও রাধার প্রবল সচেতনতা পদটিতে সুস্পষ্ট। প্রেমিক কৃষ্ণ রাধার জন্য প্রতীক্ষায় থেকে পথযাত্রার শেষে রাধার সেবা করে তাঁর ভালবাসার প্রকাশ ঘটান। অন্যদিকে অবলা নারী হয়েও রাধাকে কৃষ্ণসান্নিধ্য পাওয়ার জন্য অনেক বেশি কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়। নারী বলেই হয়তো সেই কৃচ্ছ্রসাধনের কৃতিত্ব তিনি বেশি করেই দাবি করেন। এই দাবির পেছনে আছে রাধার মধুর অহংকার। এই অহংকারেরও

জনয়িতা কৃষ্ণই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বৃন্দাবনবিহারী রাধাপ্রেমিক কৃষ্ণের বীরত্বব্যঞ্জক অসাধারণ কীর্তিগুলির পাশাপাশি নিজের পীতবাস দিয়ে রাধার চরণধূলি মুছে নেওয়ার প্রসঙ্গও যে অসামান্য পৌরুষের দ্যুতি ফুটিয়ে তোলে, রাধার অহংকারের মূলে তাই-ই। প্রেমিকার প্রেমকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য যিনি তাঁর পায়ের ধূলা মুছিয়ে দেন- তাঁর জন্যই তো রাধা নিজের পদপঙ্কজকে পঙ্কে বিভূষিত করতে পারেন। কৃষ্ণের উপহাসে বা অবজ্ঞায় এই কৃচ্ছ্র সাধন ব্যর্থ হবে না, স্বীকৃতিতে ধন্য হবে- এটা জেনেই রাধার কণ্ঠে এই মধুর নির্লজ্জ আত্মপ্রশংসা উচ্চারিত হয়েছে।

৯.৬। মানের পদে গোবিন্দদাস

উৎকণ্ঠিতা নায়িকার হৃদয়বেদনা ও অপমানবোধ বৈষ্ণব পদাবলীর কবিদের একটি প্রিয় প্রসঙ্গ। গোবিন্দদাস উৎকণ্ঠিতা নায়িকাকে নিয়ে অনেকগুলি পদ রচনা করেছেন।

'ভুজগে ভরল পথ'

শীর্ষক পদটিতে উৎকণ্ঠিতা রাধার সেই বেদনারই প্রকাশ ঘটেছে। সংকেতকুঞ্জে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে রাধা মনে মনে ভেবেছেন, ঘোর বর্ষার রাত্রিতে কত শত বজ্রপাত হচ্ছে। পথে কত সাপ। আরও কত রকমের বিপদ মাথায় করে রাধা কুঞ্জে অভিসারে এসেছেন। কিন্তু কৃষ্ণকে না দেখে এখন তিনি ভাবছেন, তাঁর পাপ প্রাণ তিনি আর রাখবেন না। রাত্রির অর্ধেক অংশ কেটে গেল, কিন্তু এখনও কৃষ্ণ এলেন না। রাধার মনের সমস্ত বাসনাই বৃথা হল। হয়তো অন্য কোন সুন্দরী নারী কৃষ্ণকে তাঁর ভ্রূরূপ ভূজঙ্গিনীর পাশে বেঁধে তার ওপর দারুণ ফুলশরের আঘাত করেছে। অথবা গুরুজনদের ভয়ে তিনি আসতে পারছেন না। কখনো আবার কৃষ্ণের বিলম্ব দেখে রাধার কাছে তাঁর অঙ্গের আভরণও অনাবশ্যক ভার বলে মনে হচ্ছে। এইভাবে উৎকণ্ঠিতা নায়িকার ব্যর্থ রাত্রি যাপনের পর কৃষ্ণ সর্বাঙ্গে অন্য নারী সম্ভোগের চিহ্ন নিয়ে সকালবেলা তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর খণ্ডিতা রাধা তীব্র বেদনায়, ক্রোধে ও অপমানে তাঁকে তিরস্কার করেছেন।

'আকুল চিকুর'

শীর্ষক পদটিতে রাধা কৃষ্ণকে ব্যঙ্গ করে বলছেন, তাঁকে এখন শিব বলেই মনে হচ্ছে। কারণ তাঁর চূড়ার যে শিখিপুচ্ছ আছে তার দ্বারা অলঙ্কৃত ললাটে সিঁদুরের ছাপই হচ্ছে শিখা। চন্দনরূপ চন্দ্রের মধ্যে শোভা পাচ্ছে যে কস্তুরী, তা যেন শিবের তৃতীয় নয়ন। রাধার প্রতি অভিলাষ অর্থাৎ প্রেম যেন তাতেই পুড়ে মরেছে। শুধু শিবের সঙ্গে পার্থক্য এইটুকু যে, শিব দিগম্বর। আর কৃষ্ণ বসন পরিধান করে আছেন। খণ্ডিতা নায়িকার এই ব্যঙ্গ জয়দেবের সময় থেকেই রাধার কণ্ঠে নানাভাবে উচ্চারিত হয়েছে। গোবিন্দদাসও এই ধরনের ব্যঙ্গ করে আরও কিছু পদ রচনা করেছেন। খন্ডিতার পদে শুধু রাধার ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ অভিযোগই নেই- ছলনাময় কৃষ্ণের উত্তর দেওয়ার ধৃষ্টতাও আছে।

'সহজেই গোরি' শীর্ষক পদটিতে কৃষ্ণ বলছেন যে রাধা এখন ক্রুদ্ধ হয়েছেন বলেই তাঁর যেন তিনটি চোখ হয়েছে। তাঁর কঠিন হৃদয় দেখে মনে হচ্ছে, রাধা যেন পাষাণ-হৃদয় হিমালয়-কন্যা গৌরী। রাধা যদি গৌরী হন, তাহলে কৃষ্ণের শিব হতে কোনো আপত্তি নেই।

'নখপদ হৃদয়ে তোহারি'

শীর্ষক পদটিতে রাধা বলেন, কৃষ্ণের হৃদয়ে অন্য নায়িকার নখর ও পদাঘাতের চিহ্ন, আর কিন্তু তাতে রাধার হৃদয় জ্বলে যাচ্ছে। কৃষ্ণের অধরে কাজল রেখা। তাতে রাধার মুখ কালো হয়ে যাচ্ছে। রাধা সারারাত্রি জেগে কাটিয়েছেন। কিন্তু তাতে কৃষ্ণের চোখ লাল হয়েছে! রাধার এখন কাঁদার ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরই বাষ্প গদ্গদ্ হয়ে উঠেছে। সুতরাং কৃষ্ণের আর রাধাকে মিনতি করার কোনও প্রয়োজন নেই। বোঝা যাচ্ছে, তিনি এবং কৃষ্ণ এক প্রাণ। শুধু দুজনের শরীর আলাদা। রাধা গৌরী, কিন্তু কৃষ্ণ শ্যামবর্ণ। তাই কৃষ্ণ যেন এখন তাঁর নিজের বাড়ি চলে যান। এই পদটিতে রাধার ব্যঙ্গ একেবারে তুঙ্গসীমা স্পর্শ করেছে। কিন্তু এতেও নির্লজ্জ কৃষ্ণের বাক্পটুতা থেমে থাকে না। 'কাঁহা নখচিহ্ন' শীর্ষক পদটিতে দেখা যায় কৃষ্ণ নিজের দোষ স্খালনের জন্যে বলছেন, রাধা যাকে নখের চিহ্ন ভাবছেন তা আসলে নতুন কুঙ্কুমের রেখা। যাকে কাজল ভাবছেন তা আসলে মৃগমদ। ফাগবিন্দুকেই রাধা সিন্দুর বলে অনুমান করেছেন। আর রাধার কাছে আসতে না পেরে উদ্বেগে রাত জাগার ফলেই তাঁর দুটি চোখ রক্তবর্ণ। কৃষ্ণের এই নির্লজ্জ

নিঃসন্দেহে ধৃষ্টনায়কের বৈশিষ্ট্যকে পুরোপুরি তুলে ধরেছে। এখানেও কবি গোবিন্দদাস উজ্জ্বলনীলমণি-র বিশ্বস্ত অনুসারী। কৃষ্ণের এই মিথ্যা ভাষণে শেষ পর্যন্ত ক্রুদ্ধা রাধা বলেছেন যে তিনি এখন একটি ব্রত করছেন। তাতে কথা বলা নিষেধ, তাই তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে আর কোনও কথা বলবেন না। খন্ডিতা রাধা এবং ধৃষ্ট কৃষ্ণের উত্তর-প্রত্যুত্তরে এই পর্যায়ের পদগুলিতে এক ধরনের নাটকীয়তাও সৃষ্টি হয়েছে।

৯.৭। কলহান্তরিতা পদে গোবিন্দদাস

কলহান্তরিতা নায়িকার এই নীরবতাই মানের চূড়ান্ত রূপ। রাধা কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই সখী কৃষ্ণের হয়ে রাধার কাছে দুঃখের কথা বলেছেন।

'প্রেম আগুনি'

শীর্ষক পদটিতে সখী বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে প্রেমরূপ আগুনের কথা স্মরণ করে দিনরাত জেগে আছেন। আর কামদেবের পিঞ্জর বা কারাগার স্বরূপ কুঞ্জে রাধারই প্রেমের একটি কণা লাভ করার জন্যে চোখের জল ফেলছেন। এখন রাধার মান করে লাভ নেই। কৃষ্ণ একান্তভাবে রাধারই। মেঘের কোলে যেমন বিদ্যুৎ শোভা পায় তেমনি কৃষ্ণের অঙ্গেও রাধা শোভা পাচ্ছেন। রাধার বিরহে কৃষ্ণ নবকিশলয়ের বলয় পরিধান করে চন্দনলিপ্ত শরীরে পদ্মপত্রের শয্যায় শুয়ে ছটফট করছেন ও মাটিতে লুটিয়ে পড়ছেন। তাঁর শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে। রাধা সব জেনেশুনেও যেন কৃষ্ণকে বার বার এভাবে আর পরীক্ষা না করেন। সখীর এই উক্তিতে রাধার মান কৃষ্ণকেও কেমন বিপর্যস্ত করে দেয় তারই পরিচয় আছে। এই মান পর্যায়েই গোবিন্দদাসের অপর একটি পদে দেখা যায় কৃষ্ণ ভুলক্রমে চন্দ্রাবলীর নাম উচ্চারণ করে ফেলায় রাধার অভিমান হয়েছে। শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি-তে একে বলা হয়েছে 'গোত্রস্খলন'।

এই মানেরই পরবর্তী স্তর হল রাধার অনুতাপ। এই অনুতপ্ত নায়িকাকেই বলা হয় 'কলহান্তরিতা'। কলহান্তরিতা রাধা কৃষ্ণকে ক্রুদ্ধভাবে তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিলেও পরে আবার তারই সঙ্গে মিলন বাসনায় ব্যাকুল হন। কিন্তু তখন কৃষ্ণ কাছে নেই। তাই রাধার কণ্ঠে অনুতাপের সুর বেজে ওঠে।

'আন্ধল প্রেম'

শীর্ষক পদটিতে রাধা বলছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভ করেছেন- এই গৌরবে অন্ধ হয়ে তিনি প্রথমে দেখেননি যে কৃষ্ণ বহুবল্লভ। তাই আরও আদর পাওয়ার আশায় তাঁর সঙ্গে কলহ করে এখন রাত্রিদিন তাঁর প্রাণ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। রাধা সখীকে তাঁর অন্তরের জ্বালার কথা বলছেন। কৃষ্ণের দোষ দেখে যে সুন্দরী রাগ করে, তাকে জগতে সন্তপ্তা হতে হয়। কৃষ্ণের মিনতিকে উপেক্ষা করে নিজের মানকে বড় মনে করার ফল এখন রাধা পাচ্ছেন। কৃষ্ণপ্রেমে তাঁর হৃদয় কাতর, কিন্তু তিনি কৃষ্ণের দর্শন পাচ্ছেন না। এখন রাধার মান তো দূরে গেছেই, সেই সঙ্গে ধৈর্যও দূরে গেছে। এখন রাধার প্রাণ থাকে কিনা তাই নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে। আবার কখনো রাধা নিজের এই অবস্থায় যেন আতঙ্কিত হয়েই অন্য নারীদেরও সাবধান করে দেন।

'কুলবতী কোই'

শীর্ষক পদটিতে রাধা বলেছেন, কেউ যেন কুলবতী হয়ে পরপুরুষের দিকে না তাকায়, আর যদিও বা তাকায়, কৃষ্ণের দিকে যেন না তাকায়। কৃষ্ণকে যদি দেখেও ফেলে, তা হলে তাঁর সঙ্গে যেন প্রেম না করে। আর নিতান্তই যদি প্রেম করে, তাহলে মান যেন না করে। রাধা এবার নিজের দোষ স্বীকার করে বলছেন, তাঁর মান-সন্তপ্ত প্রাণ এখনো বেরিয়ে যাচ্ছে না। কৃষ্ণের ওপর রাগ করা যায় না। তিনি রাধার চরণ স্পর্শ করার লালসায় লক্ষ মিনতি জানালেন। এখন তাঁকে ছাড়া রাধার দেহ জর্জর হল। স্পর্শমণির স্পর্শলাভের মতো তাঁর সঙ্গও দুষ্প্রাপ্য হল। সখীরা মিলে কতরকমে রাধাকে বোঝালেন। কিন্তু সে-সব কথা রাধা শোনেননি। তাই আজ তার ফল ভোগ করছেন। অনুতপ্ত রাধার এই আর্তনাদ হিতাকাঙ্ক্ষিনী সখীদের সহমর্মিতা জাগিয়ে তোলে। সখী রাধাকে তিরস্কার করেন।

'শুনইতে কানু'

শীর্ষক পদটিতে সখী বলেন, কৃষ্ণের বংশীধ্বনি যাতে রাধা না শোনেন, সেজন্যে তিনি তাঁর কান দুটি বন্ধ করে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন প্রেম-বিভোর রাধা সখীকে

বাধা দিয়েছিলেন। তাই সখী বলছেন, তখনই রাধাকে বলেছিলেন, ভুল করেও কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করলে সারা জীবন চোখের জল ফেলে কাটাতে হবে। কিন্তু তখন রাধা গুণের-পরীক্ষা না করে অন্যের রূপলালসায় নিজের দেহকে সমর্পণ করলেন। এখন দিনে দিনে তার সেই অপূর্ব রূপলাবণ্য তিনি হারিয়ে ফেলছেন। শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন কিনা, সে ব্যাপারেও সংশয় দেখা দিয়েছে। কৃষ্ণরূপ মেঘ থেকে বারিবর্ষণের আশায় রাধা নিজের হৃদয়ে যে প্রেমতরু রোপণ করেছিলেন, এখন দুচোখের জল দিয়ে সেই প্রেমতরুকে সিঞ্চন করে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সখীর এই তিরস্কারে রাধার প্রতি তাঁর মমতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, সেই সঙ্গে কলহান্তরিতা রাধার কৃষ্ণপ্রেমের প্রগাঢ়তা ও কৃষ্ণবিরহের আর্তিও প্রকাশিত হয়েছে।

'চরণে লাগি হরি'

শীর্ষক পদটিতে কলহান্তরিতা অনুতপ্তা রাধা বলছেন, অনেক যত্ন করে মালা গেঁথে কৃষ্ণ তাঁর পায়ে ধরে সেই মালা তাঁর গলায় পরিয়েছিলেন। কিন্তু রাধা মান করে সে মালা দূরে ছুঁড়ে ফেলেছেন। রাধার এই মানের আগুনেই যেন কৃষ্ণ ফিরে গেছেন। যিনি গোবর্ধনধারী মহাবীর, তিনি রাধার হাত ধরে অনেক সাধলেন। কিন্তু তাতে রাধা একবারও ফিরে তাকাননি। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছেন। কৃষ্ণ বহুবল্লভ, তাঁকে পাওয়া খুব সহজ কথা নয়। কিন্তু তাঁকে না দেখে রাধার মন কাঁদছে। কলহান্তরিতা রাধার এই উক্তিতে কৃষ্ণের জন্যে তাঁর আর্তি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে রাধার ঐশ্বর্য সচেতনতা মধুর রসের অবিমিশ্র প্রবাহকে ঈষৎ ব্যাহত করেছে। এই পদটিতেও শ্রীরূপের একটি পদের প্রভাব লক্ষ করা যায়-

'সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরম্।

যদভজমিহ নহি গোকুলবীরম।

নাকর্ণয়মপি সুহাদুপদেশম্।

মাধব চাটুপটলমপি লেশম্।

নালোকয়মর্পিতমুরু হারম্।

প্রাণমন্তষ্ঞ দয়িতমনুবারম্।

হন্ত সনাতনগুণ মভিযান্তম্।

কিমধারয় মহমুরসি ন কান্তম্॥'

এই পদে রাধা সখীকে সম্বোধন করে বলেছেন, তাঁর অধীর হৃদয় অবসন্ন হচ্ছে। তিনি গোকুলবীরকে ভজনা করলেন না। তাঁর প্রণয়পূর্ণ চাটুবাক্যেও কর্ণপাত করলেন না। প্রেমিক তাঁর গলায় বিশাল হার পরালেন। বারবার প্রণাম করলেন। কিন্তু রাধা একবার ফিরেও দেখলেন না। তাঁর সনাতন প্রাণকান্ত এসে ফিরে গেলেন। কিন্তু রাধাতাঁকে কেন বক্ষে ধারণ করলেন না- এই ভেবে তাঁর অনুতাপ হচ্ছে। গোবিন্দদাসের পদটি এর একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ নয়। তবে মূল পদের ভাবকে কবি পুরোপুরিই অনুসরণ করেছেন। শ্রীরূপের পদেও কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব অর্থাৎ বীরত্বের কথা আছে। কিন্তু গোবিন্দদাস গোবর্ধনধারী কৃষ্ণের বিশেষ ঐশ্বর্য মূর্তিকেই রূপ দিয়েছেন।

'কানু উপেখি ধনি'

শীর্ষক পদটিতে কবি গোবিন্দদাস কলহান্তরিতা রাধার একটি বিষন্ন- সুন্দর মূর্তি নির্মাণ করেছেন। কৃষ্ণকে উপেক্ষা করার পর রাধা একা নির্জন-গৃহে বসে তাঁর কথাই ভাবছেন। তাঁর দুচোখ থেকে অবিরত জল ঝরে পড়ছে। তাঁর পদ্মের মতো মুখ চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। মুখ নিচু করে রাধা মনে মনে তাঁর প্রেমিকের গুণের কথা ভাবছেন এবং নখ দিয়ে মাটিতে লিখছেন। এইভাবে বিরস বদনে রাধা যখন বসে আছেন, সখীরা তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন এবং সখীদের কারও মুখে কোনও কথা নেই। বেদনা-ম্লান, অশ্রুসিক্তা রাধার এই ছবিটি যেন মহৎ শিল্পীর আঁকা বর্ণবিরল অথচ জীবন্ত চিত্রশিল্প। অলঙ্কারের বাহুল্য নেই বলে রাধার হৃদয়বেদনা প্রকাশের ইঙ্গিতগুলি সুপরিবাহী হয়েছে।

পদাবলী সাহিত্যে কলহান্তরিত, পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস। এখানে মানিনী রাধা মানভঙ্গে দুঃখ করে বলেন-

'যাকর চরণ নখর-রুচি হেরইতে

মুরছয়ে কত কোটি কাম।

সো মঝু পদতলে ধরণী লোটায়ল

পালটি না হেরল হাম।।'

যার দরশনের জন্য কামদেবও মূর্ছায়ত সেই রাধাপ্রেমের কামাল শ্রীহরিকে তিনি (রাধা) একবার ফিরেও দেখলেন না।

৯.৮। মাথুর পদে গোবিন্দ দাস

বিরহের পদে গোবিন্দদাসের সাফল্য বিদ্যাপতির সঙ্গে তুল্যই নয়- বরং কোনও কোনও সমালোচকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এ-পর্যায়ে তাঁর ব্যর্থতা প্রকট হয়েছে। কিন্তু তবুও উজ্জ্বলনীলমণির একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে বিরহ পর্যায়ে গোবিন্দদাসের অবদানকে উপেক্ষা করা যায় না। আবার কখনো কখনো বিদ্যাপতির অসম্পূর্ণ পদ তিনি পূরণও করেছেন। সেই সমস্ত পদে তিনি সফল।

'প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল'

শীর্ষক পদটি এই ধরনেরই একটি পদ। ভূত-বিরহের এই পদটিতে রাধার আক্ষেপ ও বেদনাই ধ্বনিত হয়েছে। রাধা বলছেন, তাঁর প্রেম যেন এক সুকুমার শ্যামল নবোদ্গত অঙ্কুর। কিন্তু তাঁর দুটি পাতা হওয়ার আগেই অর্থাৎ প্রেমের বিকাশ হওয়ার আগেই বিরহের উত্তাপে তা শুকিয়ে গেল। প্রতিপদের চাঁদ যেমন উদিত হয়েই অস্তে চলে যায়, তেমনি রাধার জীবনের ক্ষণকালীন কৃষ্ণমিলনের সুখের আশাও নিরাশায় পরিণত হল। রাধা বলছেন, কে জানত যে চাঁদ চকোরীকে বঞ্চনা করবে, সুজন মধুপ বঞ্চনা করবে মাধবীকে? কৃষ্ণের প্রেমের স্বরূপ অনুভব করেই রাধা অনুমান করতেন, বিধাতাই এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রাণ তো আর কাউকে জানে না- কেবলই কানু কানু করে রোদন করে। প্রকৃতিজগতের কতকগুলি দৃষ্টান্তের তির্যক ব্যবহার করেই রাধা তাঁর প্রেমের স্বল্পকাল স্থায়ী, আর ক্ষীণ-পরমায়ু প্রেমের জন্য নিজের বেদনাকে ভাষা দিয়েছেন। বিদ্যাপতি বলছেন, মাধব নিষ্করুণ- গোবিন্দদাস কিন্তু বলছেন তিনি রসপূর্ণ। বাঙলা দেশে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির এধরনের পদে এমন কিছু পরিমার্জন হয়তো

গোবিন্দদাসের হাতেই ঘটেছিল কবি স্বভাবের সাধর্মবশত। পদটি তারই নিদর্শন। কিন্তু কবি-স্বভাবের সাধর্ম থাকলেও দুই কবি-ব্যক্তিত্বের পার্থক্যটিও এখানে লক্ষ্য করার মতো। বিদ্যাপতি রাজসভার কবি এবং চৈতন্য-পূর্ব যুগের কবি। তাঁর সামনে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্মের 'অখিলরসামৃতসিন্ধু' কৃষ্ণের মূর্তি ছিল না। তাঁর কৃষ্ণ দেবতা হলেও নাগরিক নায়ক। তাই তাঁকে নিষ্করুণ হিসেবে দেখা বিদ্যাপতির পক্ষে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের ঐতিহ্য-লালিত দীক্ষিত বৈষ্ণব গোবিন্দদাস কৃষ্ণের আপাত নিষ্ঠুরতার প্রতি রাধার অভিমানের কথা মনে রেখেও তাঁকে রসময় বূপেই দেখেছেন।

গোবিন্দদাসের অপর একটি বিরহের পদে রাধা দশমী দশায় উপনীতা।

'যাঁহা পঁহু অরুণ চরণে চলি যাত'

শীর্ষক পদটিতে রাধা বলছেন, মৃত্যুর পরও নিজের দেহের রূপ রস প্রভৃতিকে পঞ্চভূতে মিলিয়ে দিয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ পেতে চান। এই আকাঙক্ষাকে শ্রীরূপ তাঁর উজ্জ্বলনীলমণিতে বিরহের একটি বিশেষ অবস্থা "মোদন"-এর পঞ্চম অনুভাব বলে অভিহিত করেছেন। এই ভাবটি বোঝানোর জন্য তিনি ষান্মাসিক নামক এক কবির শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন-

'পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তি স্ফুটং

ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাতে বরম্।

তদবাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গনে

ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেহনিলঃ ॥

আমার এই দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হোক। পঞ্চমহাভূতও নিজের নিজের বিভাগে প্রবেশ করুক। তবু আমি বিধাতাকে অবনতমস্তকে প্রণাম করে এই একটি মাত্র বরই প্রকটভাবে প্রার্থনা করছি যে শ্রীকৃষ্ণের অবগাহন সরোবরে আমার দেহস্থিত জলাংশ, তাঁর দর্পণে জ্যোতির অংশ, তাঁর অঙ্গনের আকাশে আমার আকাশ অংশ, তাঁর যাতায়াত পথে মৃত্তিকা এবং তাঁর তালব্যজনে আমার দেহের বায়ু অংশ প্রবিষ্ট হোক। গোবিন্দদাস এই শ্লোকটির

ভাবানুসরণেই পদটি রচনা করেছেন। তাঁর রাধা বলছেন, কৃষ্ণ-বিরহে যদি তাঁর মৃত্যু হয় তাহলে তাঁর দেহ পঞ্চভূতে মিশে যাবে। তখনো যেন শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই তাঁর শরীর নিয়োজিত হয়। কৃষ্ণ যেখান-যেখান দিয়ে তাঁর রক্তিম চরণ ফেলে চলে যান, সেখানে সেখানেই যেন রাধার দেহ মাটি হয়। যে সরোবরে কৃষ্ণ স্নান করেন, রাধা যেন সেখানেই জল হন। এইভাবে যদি রাধার কৃষপ্রাপ্তি হয়, তাহলে তাঁর কাছে 'বিরহ মরণ নিরদ্বন্দ্ব। কারণ রাধামোহন ঠাকুরের ভাষায়-'মরণেনগোকুলমন্ত্রপ্রাপ্তির্ভবতি'। রাধা চাইছেন, যে দর্পণে কৃষ্ণ নিজের মুখ দেখেন, তাঁর অঙ্গের জ্যোতি যেন তাতে মিশে যায়, যে পাখা দিয়ে কৃষ্ণকে বীজন করা হয় রাধার শরীর যেন সেই পাখাতেই বায়ু হয়। আর সেখানে জলধর শ্যাম কৃষ্ণ ভ্রমণ করেন রাধার অঙ্গ যেন সেখানেই আকাশ হয়। ভণিতায় গোবিন্দদাস বলছেন যে, মরকতশ্যাম কৃষ্ণ স্বর্ণবর্ণা রাধাকে পরিত্যাগ করবেন না। মূল শ্লোকটিকে তিনি তাঁর পদে বিশ্বস্তভাবেই অনুসরণ করেছেন। রাধার প্রেমের প্রকাশ এখানে গভীর ও আবেগময়। কিন্তু গোবিন্দদাসের ব্যক্তিসত্তার কোনও আবেগ এখানে সঞ্চারিত নয়। উজ্জ্বলনীলমণি-র বাঁধা ছকের বাইরে তিনি এক পাও বাড়াননি।

উজ্জ্বলনীলমণি-র প্রকরণ অনুযায়ী গোবিন্দদাস সুদূর প্রবাসের অন্তর্ভুক্ত ভবনবিরহের পদও রচনা করেছেন।

'নামহি অক্রূর'

শীর্ষক পদটিতে রাধা সখীকে বলছেন, মথুরা থেকে কৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যিনি ব্রজে এসেছেন, তাঁর নাম অক্রূর হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর মতো ক্রূর আর কেউ নেই। আজ প্রতি ঘরে ঘরে তিনি অমঙ্গলজনক শব্দ ঘোষণা করে চলেছেন যে, আগামীকালই কৃষ্ণ চলে যাবেন। তাই সবাই যেন প্রস্তুত থাকে। রাধা সখীকে অনুরোধ করছেন, সখী যেন এমন কোনও উপায় অবলম্বন করেন যাতে রাত্রি আর প্রভাত না হয়। তাহলে কৃষ্ণ বাড়িতেই থাকবেন। কোনও যোগিনীর পায়ে ধরে অনুরোধ করা হোক, সে যেন তার যোগবলে চন্দ্রকে বেঁধে ফেলে, অর্থৎ চন্দ্রের গতি স্তব্ধ করে দেয়। এর ফলে নক্ষত্র-সহ চাঁদ আকাশেই ব্যস্ত থাকবে। রাত্রি আর প্রভাত হবে না। রাধা আরও বলছেন, যমুনাদেবীর কাছে যেন প্রার্থনা করা হয়, তিনি যেন তার পিতা সূর্যকে উদিত হতে নিষেধ করেন।

ভণিতায় গোবিন্দদাস বলছেন, সূর্য কি তাঁর পুত্র যমকেও এনে রাধার সঙ্গে মেলাবেন? তাহলে রাধার যন্ত্রণার নিষ্কৃতি ঘটবে। কৃষ্ণের বিচ্ছেদ বৃন্দাবনবাসীর পক্ষে কতখানি মর্মান্তিক ঘটনা, পদটির প্রথমাংশেই তা প্রকাশিত। দুখের এই মহিমান্বিত রূপ আমাদের অনুভূতিকে স্পর্শ করে। সেই সঙ্গে সখীর প্রতি রাধার এই অবাস্তব অনুরোধ তাঁর অসহায়তা ও অস্থিরতাকেই প্রকট করে তোলে। বিদ্যাপতির অভিসারিকা রাধা প্রচুর অর্থ দিয়ে মেঘকে তাঁর অভিসার রাত্রে বর্ষণ ঘটানোর অনুরোধ করেছিলেন। আর এখানে রাধা প্রকৃতির আবর্তনকেই স্তব্ধ করে দিতে চাইছেন। কৃষ্ণবিরহ রাধার কাছে কতখানি মর্মান্তিক, এই অসম্ভব আকাঙ্ক্ষাই তা প্রমাণ করে দিচ্ছে।

গোবিন্দদাস মাথুর পর্যায়ের পদে সম্পূর্ণ ব্যর্থ যে নন, আলোচিত পদগুলি তারই প্রমাণ। তবে বিদ্যাপতির তুলনায় নিঃসন্দেহে গোবিন্দদাস দুর্বল। বিরহের পদে যেখানে গভীর বেদনার স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণই আকাঙ্ক্ষিত, গোবিন্দদাস বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেখানেও অলঙ্কার ব্যবহারে বাহুল্য ঘটিয়েছেন। কিন্তু রাধার বেদনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে ভাষাকে এইভাবে অলঙ্কৃত করে ফেলাতেই তাঁর পদের উৎকর্ষের অভাব ঘটে গিয়েছে।

৯.৯। মিলনের পদে গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাসের একটি রসোত্তীর্ণ পদকে ড. বিমানবিহারী মজুমদার পাঁচশত বৎসরের পদাবলী-তে স্বপ্নমিলনের অন্তর্ভুক্ত করলেও পদটিতে স্বপ্নের কোনো প্রসঙ্গই নেই। তবে গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁর যুগ গ্রন্থে এটিকে যথার্থভাবেই মিলন ও সম্ভোগের পদ বলা হয়েছে। পদটি আবার ক্ষণদাগীতচিন্তামণি-তে জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়, কিন্তু পদকল্পতরু, গীতচন্দ্রোদয়, পদামৃতসমুদ্র, সংকীর্তনামৃত এবং কীর্তনানন্দে পদটি গোবিন্দদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের সাক্ষ্যে এটিকে গোবিন্দদাসের পদ হিসেবেই গ্রহণ করা হয়। পদটিতে মুগ্ধা নায়িকা রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের প্রথম মিলন বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের বিলাস দূরে থাক, আলাপ পরিচয় করাই খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াল। রাধা চকিত চোখে মাঝে মাঝে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে মাথা হেট করে পায়ের নখ দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটছেন। অথচ তাঁর চোখ সতর্ক হয়ে আছে- পাছে কোন দিক দিয়ে মাধব তাঁকে এসে ধরেন। কৃষ্ণ প্রেমকলায় বিদগ্ধ নায়ক। তিনি রাধাকে

অনুনয় করে তাঁর পা ধরার জন্য হাত বাড়ালেন। রাধা হাত দিয়ে কৃষ্ণকে বারণ করতে গেলে দুজনের হাতে হাত লাগল। এই স্পর্শের আনন্দে রাধার মনে প্রেম জন্মাল। সেই প্রেমবতী-রাধাকে দেখে কৃষ্ণের মনে হল, দরিদ্র ব্যক্তি যেন ঘটভরে সোনা পেল। রাধা একবার মুখ দেখিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। যেন রত্নদান করে আবার কেউ চুরি করে নিল। রাধা-মাধবের এই প্রথম মধুর মিলনের দৃশ্য গোবিন্দদাস যেন সাক্ষাৎ দেখছেন- 'আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস'। পদটিতে মুগ্ধ নায়িকা এবং বিদগ্ধ নায়কের প্রথম মিলন গৌড়ীয় বৈষ্ণব চিত্রণ হিসেবে গ্রহণ করাও যেতে পারে। গোবিন্দদাসের মতো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তত্ত্বানুসারী কবির এই জীবনানুসারী পদ বৈষ্ণব পদাবলীর তত্ত্বনিরপেক্ষ আস্বাদনযোগ্যতা সম্পর্কে আমাদের প্রতীতিকে আরও দৃঢ় করে। রাধাকৃষ্ণের এই প্রথম সমাগম নিয়ে গোবিন্দদাসের আরও পদ পাওয়া যায়। মিলন বর্ণনাতেও গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। এক্ষেত্রে বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করলেও গোবিন্দদাসের ভক্তিতদ্গতচিত্তের প্রকাশে পদগুলি অপরূপ হয়ে উঠেছে। একটি পদে অবিরল বারিবর্ষণ আর বিদ্যুৎ ঝলকের পটভূমিতে রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণনায় গোবিন্দদাস অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বৃন্দাবন সখীবেষ্টিত শুক-সারী ও ময়ূর-ময়ুরীর নৃত্যের মাঝখানে রাধাকৃষ্ণের মিলন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেরই বিশেষ আবহকে সৃষ্টি করেছে। বিদ্যাপতির পক্ষে এই ধরনের পদ রচনা সম্ভবই ছিল না।

৯.১০। রাসলীলার পদে গোবিন্দদাস

অভিসারের পরই গোবিন্দদাস যে পর্যায়ে সর্বাধিক সিদ্ধি অর্জন করেছেন, তা হল রাসের পদ। এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠকৰি হিসেবেও তাঁকে চিহ্নিত করা যায়। রাসলীলার মধ্যে যে তাঁর আকাঙক্ষা রয়েছে তার কাব্যরূপ দিয়েছেন গোবিন্দদাস। অভিসারের সঙ্গে রাসলীলার সম্পর্ক আছে গতির দিক থেকে। তবে অভিসারের মধ্যে রাধার যে আত্মসচেতনতা, রাসলীলায় গোপীদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে তা অনুপস্থিত। পশ্চাতের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করার প্রবল বাসনাও রাসের মধ্যে লক্ষ করা যায়। এখানেও গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রাসলীলার আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা অতি গভীর। হরিবংশ-এ একে বলা হয়েছে 'হল্লিসক ক্রীড়া'। হরিবংশ-এ বর্ণিত রাসলীলা শুরু পক্ষের শারদ রাস। এখানে

গোপবালক ও গোগীরা কৃষ্ণকে ঘিরে মন্ডলাকারে নৃত্য করে। ব্রজ যুবতীরা পিতামাতা ও পরিজনের নিষেধ অমান্য করে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন। বিষ্ণুপুরাণ-এ আছে, কৃষ্ণের প্রেমময় সঙ্গীতে আকৃষ্ট গোগীদের নিয়ে তিনি রাস-মণ্ডল রচনা করলে গোপীরা অনুলোম ও প্রতিলোম গতিতে তাঁর নাম জপ করে নৃত্য করে। গৃহের আকর্ষণ তুচ্ছ করে গোগীরা রাত্রে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলে পরব্রহ্মরূপী কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে রমণ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। এমনকি গৃহে আবদ্ধ গোপীরাও কৃষ্ণের কথাই মনে মনে চিন্তা করে মোক্ষলাভ করেন। হরিবংশ-র রাসলীলা যেন কিছু পরিমাণে প্রাকৃতজনসুলভ। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ-এর রাসলীলা পরিপূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক। ভাগবত-এও এই আধ্যাত্মিকতারই স্ফূরণ ঘটেছে। ভাগবত-এর রাসলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী। গোপীগণের সঙ্গে তাঁর রাসলীলা ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং গোপাঙ্গনারাও একান্তভাবে কৃষ্ণভক্ত। তাঁরা কামনাশূন্যভাবেই কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করেন। গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিরা ভাগবত-কে অনুসরণ করে রাসলীলা বর্ণনা করেছেন। ভাগবত-এও শারদ রাসই বর্ণিত হয়েছে। ভাগবত-এর দশম স্কন্ধের ২৩ অধ্যায়ে রাসলীলা বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায় পাঁচটিকে একসঙ্গে রাসপঞ্চাধ্যায় বলা হয়। অভিসারের মতো রাসের মধ্যেও একটা প্রবল গতির ব্যাপার আছে। কৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনির অনিবার্য আকর্ষণে গোগীরা তাঁদের গৃহপরিজন, অলঙ্কার, ভূষণ, প্রসাধন-সমস্ত কিছু ফেলে তীব্র গতিতে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। জাগতিক সমস্ত কিছুই আংশিকতায় আক্রান্ত। একমাত্র ঈশ্বরই পূর্ণ। সেই পূর্ণের সঙ্গে মিলনের জন্যে, অর্থাৎ নিজের আংশিকতাকেই পূর্ণ করার জন্যে গোগীদের এই গতির আবেগ আমাদের রবীন্দ্রনাথের ‘চঞ্চলা’ কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়-

‘শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও

উদ্দাম উধাও;

ফিরে নাহি চাও,

যা কিছু তোমার, স্ব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।’

আবার রাসলীলার আদিম উৎস হিসেবে পন্ডিতেরা আদিবাসী নৃত্যের কথা বলে থাকেন। জীবনানন্দের কবিতায় আমরা তারই আভাস পাই-

‘ডেকে লব আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের সব;

মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে,

শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।

হাতে হাত ধরে ধরে গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে।

কার্তিকের মিঠা রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে;’

(ধূসর পান্ডুলিপি : অবসরের গান)

এখানেও হেমন্তের পটভূমিতে পাড়াগাঁর আইবুড়ো মেয়েরা হাত ধরে ধরে গোল হয়ে নেচেছে। আইবুড়ো শব্দটির ব্যবহার গোপীদের প্রেমার্তির তীব্রতার সঙ্গে কিভাবে যেন সমান্তরলতা পেয়ে যায়।

‘শরদ চন্দ পবন মন্দ’

শীর্ষক পদটিতে গোবিন্দদাস রাসলীলার পূর্ববর্তী সময়ে গোপীদের অবস্থা ও তাঁদের গতির তীব্রতাকে বর্ণনা করেছেন। সেই সঙ্গে আছে প্রকৃতির উজ্জ্বল সৌন্দর্যময় পটভূমির স্বাভাবিক চিত্রণ। শরৎকালের আকাশে চাঁদ উঠেছে, বাতাস মৃদু মৃদু বইছে। উদ্যান ভরে উঠেছে ফুলের গন্ধে। প্রস্ফুটিত মল্লিকা মালতী যূথীর গন্ধে ব্যাকুল মধুকর মধুপান করে মত্ত হয়েছে। রাত্রির এই মনোহর সৌন্দর্য দেখে মোহন কৃষ্ণ প্রেমমত্ত হয়ে কুলবতীর চিত্তহরণকারী মধুর সুরে বাঁশী বাজাতে লাগলেন। এইখানেই ভাগবতের কৃষ্ণের সঙ্গে গোবিন্দদাসের কৃষ্ণের পার্থক্য ঘটে গেছে। ভাগবত-এর কৃষ্ণ পরম ঐশ্বর্যময় ভক্তবৎসল ভগবান। তাই শারদোৎফুল্লমল্লিকা রাত্রি দেখে তিনি গোপীদের দয়া করে যোগমায়াকে আশ্রয় করে তাঁদের সঙ্গে বিহার করেছেন। সুতরাং ভাগবত-এর রাসলীলায় কৃষ্ণ-গোপী প্রেমের পারস্পরিকতা নেই। কিন্তু গোবিন্দদাসের পদে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কৃষ্ণ গোপীদের প্রেম আকাঙ্ক্ষা করেই বাঁশী বাজান। গোপীরা যেমন কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল,

কৃষ্ণও অনুরূপভাবেই তাদের জন্যে ব্যাকুল। গোপীরা কৃষ্ণের এই বংশীধ্বনি শুনে মনে মনে কৃষ্ণের কাছে নিজেদের অর্পণ করলেন। বংশীর শব্দ তাদের যেখানে যেতে বলল, তারাও সেখানে চললেন। নিজেদের গৃহ তারা ত্যাগ করলেন, শরীরের কথা ভুলে গেলেন। তাদের একচোখে কাজলের রেখা, তাদের একটি চরণে নূপুর, একটি কানে কুন্ডল। এই অবস্থাতেই অসমাপ্ত প্রসাধনে তারা পথে বেরিয়ে পড়েছেন। তাদের নীবিবন্ধন শিথিল হয়ে গেল। চলার বেগে বসন স্খলিত হয়ে পড়ল রসনা চেলি সমস্তই খুলে গেল। বেণীবিগলিত আলুলায়িত কুন্তলে তারা সবাই কৃষ্ণের কাছে দ্রুতগতিতে চললেন। কিন্তু তাদের মন এতই কৃষ্ণ নিমগ্ন যে পথে তারা কেউ কাউকে দেখতে পেলেন না এই ভাবেই তারা গোকুলচন্দ্র কৃষ্ণের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। শারদ রাসের এই পদটিতে হয়েছে। অনিবার্য আকর্ষণ আর অনিবারণীয় গতির আবেগ- রাসলীলার পদে এই দুটি বৈশিষ্ট্যকেই গোবিন্দদাস ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

‘বিপিনে মিলল গোপনারী’

শীর্ষক পদটিতে গোপবধূদের সঙ্গে কৃষ্ণ মধুর ছলনাময় কৌতুকে মেতেছেন। গোপবধূরা সবাই কৃষ্ণের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাদের দেখে বংশীধারী কৃষ্ণ হেসে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন- তাদের জন্য তিনি কি করতে পারেন এবং ব্রজের সমস্ত কুশল কিনা? কৃষ্ণের এই আপাত নিরীহ প্রশ্ন আসলে যেন গোপীদের প্রেমসিন্ধু কতটা গভীর সেটি পরীক্ষার জন্য উচ্চারিত হল। কৃষ্ণ আরও জিজ্ঞাসা করলেন, এই ঘোর রাত্রিকালে যুবক স্বামীর সান্নিধ্য ত্যাগ করে কি কারণে তারা অরণ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কৃষ্ণের আরও প্রশ্ন-

‘গলিত ললিত কবরীবন্ধ

কাহে ধাওত যুবতিবৃন্দ।

মন্দিরে কিয়ে পড়ল দন্দ

বেঢ়ল বিশিখবাহিনী॥’

আবার কৃষ্ণ নিজেই গোপীদের কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে বলছেন, হয়তো কোন বিপদ-আপদই হয়নি, শরৎ পূর্ণিমার সুন্দর রাত্রি, ফুলে ফুলে ভরা কুঞ্জ আর তার মাঝখানে ভ্রমরের শোভা এগুলি দেখার জন্যেই সম্ভবত তাঁরা স্বাধীনভাবে চলে এসেছেন। পদটির মধ্যে বেশ নাটকীয়তা আছে। কৃষ্ণ পরপর নিজেই প্রশ্ন করে গেছেন- গোপীদের কাছ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে যেন পূর্বসিদ্ধান্তকে ভেঙে ফেলে অন্য একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর দায়িত্ব তিনি নিজেই বহন করেছেন। গোপীদের প্রতিক্রিয়া গোটা পদটিতে মাত্র একটি পংক্তিতে বর্ণিত হয়েছে। তাও কৃষ্ণেরই উচ্চারিত একটি প্রশ্নের মাধ্যমে, 'কাহে কুটিল চাহনি'। এর আগের পংক্তিগুলিতে কৃষ্ণের যে প্রশ্ন, তা ভাগবত থেকেই গৃহীত। ভাগবতেও গোপীরা কৃষ্ণের কাছে এসে উপস্থিত হলে কৃষ্ণ ছলনা করে বলেছেন-

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।

ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রতাগমনকাঝণম্॥

'কাহে কুটিল চাহনি' গোবিন্দদাসের নিজস্ব সংযোজন। গোপীরা কৃষ্ণের এই প্রশ্নে ক্রুদ্ধ তারই মুখে এই ধরনের প্রশ্নে গোপীদের কি পরিমাণে আহত করেছে, তারই প্রকাশ কৃষ্ণের এহ প্রশ্নের মধ্যে। কৃষ্ণ যে সব কিছু বুঝেও না বোঝার ভান করছেন তাও এ প্রশ্নের ভঙ্গিতেই ফুটে উঠেছে। সব মিলিয়ে পদটির আধ্যাত্মিকতা যতই গভীর হোক না কেন বহিরঙ্গের কৌতুক রসজ্জ্বালতাও কোন অংশেই উপেক্ষণীয় নয়। কৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তর গোপীরা দিয়েছেন ‘ঐছন বচন কহল যব কান’ শীর্ষক পদটিতে । ব্রজগোপীদের চোখ জলে ভরে গেল। তারা কৃষ্ণকে বললেন যে, প্রভু যেমন ক্রীতদাসীকে চুল ধরে টেনে আনে, কৃষ্ণের বাঁশীও তেমনি জোর করে তাদের টেনে এনেছে। আর এখন কৃষ্ণ তাদের ধর্মের কথা শোনাচ্ছেন। এখন তারা কৃষ্ণকে ছেড়ে কোথায় যাবেন। কৃষ্ণ গোপীদের এই অনন্যপরতন্ত্র প্রেমের পরিচয় পেয়ে গভীর আনন্দ লাভ করলেন। এরপর গোবিন্দদাস রাসের বিবিধ নৃত্য বর্ণনা করেছেন। রাসলীলার আনন্দময় প্রতিক্রিয়া প্রকৃতিকেও প্রভাবিত করেছে। গোবিন্দদাসের একটি পদে রাসমন্ডলে যুগল কিশোর নাচছেন। আর সেই নৃত্য দেখে

‘ভাবভরে তবু সব লম্বিত হইয়া।

দোঁহার চরণতলে পড়ে লোটাইয়া॥’

রাধাকৃষ্ণের নৃত্যে প্রকৃতির এই স্বতঃস্ফূর্ত নর্তনশীলতা রাসক্রীড়ার পটভূমিকে যেন সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। ভাগবতের রাসলীলা কৃষ্ণপ্রেমমোহিত গোপীদের সন্তুষ্ট করার জন্যে ঈশ্বরের ছলনা, অন্যদিকে, গোবিন্দদাসের রাসলীলা প্রাণময়, রাধার সঙ্গে প্রেমগৌরবে গরিয়ান।

৯.১১। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দ দাস

গৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। কিন্তু এই পর্যায়ে অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হলেন এই লীলার পরোক্ষ অভিজ্ঞতাঋদ্ধ ভক্তকবি গোবিন্দদাস। অকৃত্রিমতাও এঁদের কারো কারো পদে চমৎকার ফুটে উঠেছে। কিন্তু 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যরূপ ও তাঁর নিগূঢ় লীলারসকে ভক্তের আবেগ এবং নির্মাণ-দক্ষ কবি- স্থপতির অসামান্য সিদ্ধিতে রূপদান করতে সমর্থ হয়েছেন একমাত্র গোবিন্দদাসই।

এই গৌরমূর্তি নির্মাণে গোবিন্দদাস তাঁর নিজস্ব কল্পনা মিশিয়েছেন, এ অভিযোগ আদৌ সত্য নয়। অপ্রত্যক্ষদর্শী হয়েও গোবিন্দদাসের আঁকা চৈতন্যমূর্তি পুরোপুরি ঐতিহাসিক মূর্তি গোবিন্দদাসের কাব্যদর্শনে তাঁর আমিত্ব কিছুই থাকে না। ঔজ্জ্বল্য ও স্পষ্টতার জন্য বিষয়ের যথার্থ বিশ্বনেই তার সার্থকতা । তাই তাঁর কাব্যে আমরা শ্রীচৈতন্যের অসামান্য ব্যক্তিত্বের ও রূপের যথার্থ প্রতিফলনই পেয়েছি।

গোবিন্দদাসের আঁকা শ্রীচৈতন্য একই সঙ্গে ভক্তের ভগবান, দীক্ষিত বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ, সর্ববিধ বিভেদ খন্ডনকারী ও মূর্তিমান প্রেমবিগ্রহ। চৈতন্য-ব্যক্তিত্বের এই পূর্ণায়তরূপ আমরা পেয়েছি কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে এবং গোবিন্দদাসের পদাবলী-তে। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় ভাব তথা তত্ত্বের প্রাধান্য, অন্যদিকে গোবিন্দদাস ভাব ও রস উভয়ের সমন্বয়ে গড়ে তুলেছেন তাঁর চৈতন্যমূর্তি। এই ভাব আবার বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র থেকেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গৃহীত। এখানে তিনি একজন দীক্ষিত বৈষ্ণবের

সাধনা-সমর্পিত চিত্তকেই তুলে ধরেছেন। কিন্তু একজন প্রথম শ্রেণীর কবি হিসেবে রসসৃষ্টিতেও তাঁর দক্ষতা কতখানি তার প্রমাণ হল, তত্ত্ব না জেনেও কিন্তু সাধারণ পাঠক তাঁর কাব্যের রস আস্বাদন করতে পারেন। এইভাবে রসপ্রবাহের সঙ্গে তত্ত্বের সংযোগ তাঁর পদাবলীতে স্থাপত্যের সুষমা ও কাঠিন্য দান করেছে। তাঁর কাব্যশরীর থেকে সেই কারণেই কোনও একটি শব্দকেও বাদ দেওয়া সম্ভব নয়- সেক্ষেত্রে কবিতাটির রস হানি ঘটবে।

‘নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে’- চিত্রটি ভাবোন্মাদ শ্রীচেতন্যের ইতিহাস-সমর্থিত মূর্তি। 'পুলক মুকুল’-এর সঞ্চারও বাস্তব ঘটনাই। শ্রীচৈতন্যদেব ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করতেন, “কবে তোমার নাম নিতে নিতে নয়নে অশ্রু ঝরবে, কবে নামোচ্চারণে কণ্ঠ বাষ্পাকুল হবে, আর দেহে রোমাঞ্চ দেখা দিবে। সেই শুভদিন আর কতদূরে” (শিক্ষাষ্টকের নাম মহিমা জ্ঞাপক ষষ্ঠ শ্লোক)। শ্রীচৈতন্যদেবের এই প্রার্থনা মূর্তি এবং গোবিন্দদাস অঙ্কিতভাব মূর্তির ঐক্য সহজেই অনুধাবন করা যায়।

প্রথম পংক্তির ‘নীরদনয়ন’ শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে অবশ্য আমাদের এক ধরনের বিভ্রান্তির মুখোমুখি হতে হয়। আমাদের মনে হয়, 'নীরদনয়ন' শব্দটির অর্থ কি মহাপ্রভুর নীরদ-নয়ন হতে নীর সিঞ্চিত হওয়ার ঘটনা? না কি রাধাভাবিত এই মানুষটিও ‘চাহে মেঘ পানে না চলে নয়ন তারা’? ‘নীরদ’ অর্থাৎ মেঘরূপী কৃষ্ণ মহাপ্রভুর নয়নে লেগেই আছে। আর সেই নীল নীরদ হতে অবিরত প্রেমবারি সিঞ্চিত হয়ে চৈতন্য-কদম্বকে কণ্টকিত করে তুলেছে। পরে ‘স্বেদমকরন্দ বিন্দু বিন্দু চূয়ত বিকশিত ভাবকদম্ব' পংক্তিটিকেও আমরা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করে দেখতে পারি। ‘স্বেদ’ অষ্ট-সাত্ত্বিকভাবের বিকার বিশেষ। ভাবোন্মত্ত মহাপ্রভুর শরীর বেয়ে অঝোরে স্বেদ ঝরে পড়ত। 'ভাবকদম্ব' শব্দটি সম্পর্কেও বলা যায়, নিশ্চিতভাবে এখানে ভাবাবস্থায় কদম্ব কোরকের সমতুল্য রোমাঞ্চ শিহরিত তনুদেহের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এরপরও ব্যঞ্জনার দিক থেকে বলা যায়, কদম্বতলে ভাব বিকশিত হচ্ছে। নিত্য বৃন্দাবনে কদম্ব বৃক্ষের নিচেই মহাভাবরূপা রাধারানীর আত্মবিকাশ। 'কদম্ব' শব্দের আর একটি অর্থ হল ‘সমূহ’ অশ্রু, পুলক, স্বেদ প্রভৃতি সাত্ত্বিক সমস্ত ভাবই মহাপ্রভুর মধ্যে বিকশিত হয়েছে- এ ধরনের একটি তাৎপর্য এখানে

গৃহীত হতে পারে। এরপর, 'কি পেখলু নটবর গৌরকিশোর' এই পংক্তিটির অর্থে কোনও জটিলতা না থাকলেও "কিশোর" শব্দটি আমাদের ভাবায়। আসলে কবি এখানে নিত্য বৃন্দাবনের চিরকিশোর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গকেই দর্শন করেছেন।

পরবর্তী অংশে কবি শ্রীচৈতন্যের রূপ ও গুণের কথা বলেছেন- 'অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু সুরধুনি তীরে উজোর'। শ্রীচৈতন্যের হেম কান্তি, কল্পতরুবৎ আচরণ (কেমন কল্প তরু?) যিনি সঞ্চরণ করে বেড়ান, যেচে ডেকে করুণা করেন, তাঁর কাছেও যেতে হয় না। সুরধনী তীরে তাঁর প্রেমবিহ্বল অবস্থা- এসবও তথ্যঘটিত সত্য। 'অভিনব' ইত্যাদির সমর্থন আছে বৈষ্ণব দর্শনে- "অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণায়বতীর্ণঃ কলৌ"- অনর্পিত বস্তু যিনি দান করেন, তিনি তো অভিনব কল্পতরুই বটে। এরপর 'চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝঙ্করু ভকত ভ্রমরগণ ভোর' কীর্তনরত ভক্তবেষ্টিত শ্রীচৈতন্যের একেবারে বাস্তব ছবি। চরণকে কবি যে 'চঞ্চল' বলেছেন, তাও নিছক বিশেষণ নয়। সংকীর্তনরত মহাপ্রভুর চরণ তো চঞ্চলই হবে, আবার অন্যদিকে নবদ্বীপ, নীলাচল, বৃন্দাবন- সর্বত্রই যাঁর চরণকমলের সৌরভ বিকীর্ণ, সেই পরিব্রাজক মহাপ্রভুর চরণ তো চঞ্চলই হবে। পরবর্তী পংক্তি 'পরিমলে লুব্ধ সুরাসুর ধাবই' বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে অবতারী সাক্ষাৎ কৃষ্ণই এখন শ্রীচৈতন্য। সুরাসুর ধাবনে তাই বিস্ময়ের কিছু নেই। নবদ্বীপ লীলায়ও তো এই ঘটনাই ঘটেছে- খোলা বেচা শ্রীধর, যবন হরিদাস প্রভৃতির মতো জগাই-মাধাই উদ্ধারে। আর 'অহনিশি রহত অগোর'- দিব্যোন্মাদ মহাপ্রভুর ছবি। তারপর 'অবিরত প্রেম রতন ফল বিতরণে/অখিল মনোরথ পূর'- শ্রীকৃষ্ণের রাধাভাব আস্বাদনের কালের সঙ্গে ভূভার-হরণের কালও এখানে মিলে গেছে। তাই পঞ্চম পুরুষার্থ অবৈতব 'প্রেম রতন ফল বিতরণ' এই 'রতন ফল' সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি- 'ত্রিজগতে আছে যত ধনরত্নমণি।

এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥' (চৈ. চ. ১/৯)

আর যত 'অখিল মনোরথ' কিভাবে পূর্ণ হয় তারও ব্যাখ্যা আছে কৃষ্ণদাসের মহাগ্রন্থে-

'মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র।

ইহার বিচার নাহি জানে দিব মাত্র ।

অর্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দিশে।

দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে ॥'

সর্বশেষে 'তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত গোবিন্দদাস রহু দূর'- এতো একজন যথার্থ বৈষ্ণবের বেদনাময় দীর্ঘশ্বাস। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ছিল অপ্রাকৃত। গোবিন্দদাসের সময় চৈতন্যদেবের বাস্তবলীলাও সেই অপ্রাকৃত্বই লাভ করেছে, সুতরাং 'গোবিন্দদাস বহু দূর'।

কিন্তু এই পদটির কাব্যরস তত্বের কাঠামোর ওপর একান্ত নির্ভরশীল নয়। 'নীরদ নয়নে' শুরু করলেই মন আবিষ্ট হয়ে যায়। যে মহাজীবনের গাথা কবি গাইছেন; তার অনুপম সুন্দর মাধুরীতে হৃদয় ভরে ওঠে। সুর এবং ছন্দের মিলনে শ্রীচৈতন্যের যে চিত্রটি ফুটে ওঠে তা যেমন অপূর্ব, তেমনি সত্যও বটে। এখানে মানব চৈতন্য এবং অতিমানব চৈতন্য কোথাও হারিয়ে যায়নি। তাঁর করুণা, প্রেম, ভাব-ভক্তি, সব কিছুই জীবনের আশ্রয় লাভ করেছে। সব কিছুই কবির অসাধারণ চিত্রাঙ্কনদক্ষতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

কবির গৌরাঙ্গ-বিষয়ক অপর একটি পদেও তত্ব এবং তথ্য মিলিয়ে শ্রীচৈতন্যের পরিপূর্ণ ভাব ও রূপবিগ্রহ ফুটে উঠেছে। পদটিতে একই সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যকান্তি ও ভাবোন্মত্ত অবস্থা রূপায়িত হয়েছে। গৌরাঙ্গের অঙ্গ- সৌন্দর্য চম্পক, শণের ফুল এবং সোনার পর্বতকেও জয় করেছে। উন্নতগ্রীবা যেন তাঁর মহাপুরুষ লক্ষণকেই প্রকটিত করেছে। কিন্তু কেবলমাত্র রূপ নয়, সেই সঙ্গে চৈতন্য-ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট পরিচয়ও এই পদে পাওয়া যায়-

'বিপুল পুলক কুল, আকুল কলেবর

গরগর অন্তর প্রেম ভরে।

লহু লহু হাসনি, গদগদ ভাষণি

কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥

নিজরসে নাচত, নয়ন ঢুলায়ত

গায়ত কত কত ভকতহি মেলি।'

মোট কথা পদকারদের মধ্যে গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যের-ভাবাবস্থার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দানে এবং তাত্ত্বিক উপস্থাপনে সবচেয়ে দক্ষ ছিলেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ। তিনি রাধাভাব ও কৃষ্ণভাব, উভয়ের দ্বারাই আক্রান্ত হতেন। এটাই হল শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ মূর্তি এবং অবতারী স্বভাব। আত্মভাবাস্বাদনের এই একান্ত বিলাস-সুখময় চৈতন্য-চিত্র গোবিন্দদাস ছাড়া অন্য কারো অঙ্কনে এতটা সাফল্যলাভ করেছে বলে আমরা জানি না। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে গোবিন্দদাসের সাফল্য শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়, শ্রীচৈতন্যের 'ভুবনমঙ্গল' রূপাঙ্কনেও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রয়োজনগত দিক থেকেও গোবিন্দদাসের চৈতন্য-বিষয়ক পদগুলির সিদ্ধি অসাধারণ। রাধাকৃষ্ণলীলার পালাকীর্তনে এগুলির কথামুখ হিসেবে ব্যবহার স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হয়ে আসছে। গোবিন্দদাসের "নীরদ নয়নে" শীর্ষক পদটির প্রথম পংক্তিটি চন্ডীদাসের নব অনুরাগিনী রাধার চিত্র 'চাহে মেঘপানে, না চলে নয়ন তারা' সার্থক ভূমিকা পদটির হিসেবে গণ্য হয়। কৃষ্ণপ্রেমবারির অবিরল সিঞ্চনে শ্রীচৈতন্যের ভাবকদম্বের বিকাশ যেন মর্মস্পর্শী কৃষ্ণকথার অমোঘ প্রভাবে শ্রীরাধারই অষ্টসাত্ত্বিক ভাববিকারেরই পূর্বাভাষ। নাম জপ করতে করতে চন্ডীদাসের পদে রাধারাণীর শরীর অবশ হয়ে আসে; আর গোবিন্দদাসের অঙ্কিত শ্রীচৈতন্যের শরীর থেকে ঝরে পড়ে বিন্দু বিন্দু স্বেদ মকরন্দ। বৈষ্ণবকবি ধ্যানলোকে দেখেন, অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের চিরকিশোরী কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে অবশ হয়ে পড়েছেন। আর কৃষ্ণচৈতন্যের তথ্যচিত্রে গোবিন্দদাস এঁকেছেন-

'বিপুল পুলক কুল আকুল কলেবর

গরগর অন্তর প্রেম ভরে।'

চন্ডীদাসের পূর্বরাগবর্তী রাধার চেতনা আত্মনিবেদনের বিপুল প্রেরণায় আক্রান্ত। আর তত্ত্বদর্শী ভক্তকবি গোবিন্দদাসের কৃষ্ণচৈতন্য চিত্রণেও প্রধানত আত্মনিবেদনব্যাকুলা

রাধাভাবের প্রেরণা কার্যকর ফলে চন্ডীদাসের পূর্বরাগের পদগুলি গান করতে গিয়ে ‘তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা’ চয়নে গোবিন্দদাসই প্রেক্ষণীয় হয়ে ওঠেন।

গোবিন্দদাসের ‘চম্পক শোন’ শীর্ষক পদটির যে অংশে ভাবব্যাকুল শ্রীচৈতন্যের মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে, সেই ‘বিপুল পুলক কুল'-এ আকুল শ্রীচৈতন্য, যিনি কখনো হাসেন, গদগদ স্বরে কথা বলেন, আর যাঁর দুচোখ থেকে মন্দাকিনী ধারার মতো ঝরে পড়ে বিরল প্রেমাশ্রু, তিনিও পূর্বরাগের প্রেমতন্ময়া রাধার কথাই মনে করিয়ে দেন। তাই এই পদটিও গৌরচন্দ্রিকা হিসেবেই গৃহীত হয়।

৯.১২। অনুশীলনী

১। গোবিন্দ দাসের পরিচয় দিয়ে গোবিন্দ দাস সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। পূর্বরাগের পদে গোবিন্দ দাসের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৩। গোবিন্দদাসের অনুরাগ পর্যায়ের পদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। গোবিন্দ দাস অভিসার পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি- আলোচনা করুন।

৫। মান ও কলহান্তরিতা পদে গোবিন্দদাসের কৃতিত্বের পরিচয় দিন।

৬। মাথুর পর্যায়ের পদে গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব আলোচনা করুন।

৭। মিলনের পদ রচনায় গোবিন্দ দাসের কৃতিত্বের পরিচয় দিন।

৮। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দ দাস- আলোচনা করুন।

৯। গোবিন্দ দাসের রাসলীলা বিষয়ক পদ গুলির পরিচয় দিন

৯.১৩। গ্রন্থপঞ্জি

১। গোবিন্দদাসের পদাবলী : বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

২। পাঁচশত বৎসরের পদাবলী : বিমান বিহারী মজুমদার

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১-৩ খন্ড) : ড.অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মন্তব্য

৪। বৈষ্ণব পদাবলী : ড. সত্য গিরি

৫। বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় নবপর্যায় : নীলরতন সেন

৬। বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস (২-৩ খন্ড) : ড. সুকুমার সেন

একক: ১০ : গোবিন্দদাসের পদাবলীর বিভিন্ন দিক বিচার

বিন্যাসক্রম

১০.১। গোবিন্দদাসের পদে রাধা-কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা

১০.২। ব্রজবুলিতে কৃতিত্ব

১০.৩। আঙ্গিক নির্মাণ ও সঙ্গীত প্রবণতা-নাটকীয়তা-চিত্রময়তায় শ্রেষ্ঠত্ব

১০.৪। গোবিন্দদাসের পদে ছন্দ ও অলংকার

১০.৫। গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতির তুলনা

১০.৬। অনুশীলনী

১০.৭। গ্রন্থপঞ্জি

১০.১। গোবিন্দদাসের পদে রাধা-কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা

গোবিন্দদাস ভক্তের শ্রদ্ধা, শিল্পীর রূপদর্শনের মুগ্ধতা ও তন্ময়তা নিয়ে রাধাকৃষ্ণের রূপবর্ণনা করেছেন। কিন্তু জ্ঞানদাসের মতো তিনি আবেগের আতিশয্যে তন্ময় হয়ে পড়েননি। এইভাবে কবি তাঁর নিজস্বতা নিয়ে রাধাকৃষ্ণের রূপবর্ণনার ক্ষেত্রেও সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। চৈতন্যপূর্ব যুগে কৃষ্ণের চোখ দিয়ে রাধার রূপই বেশি বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ কৃষ্ণ সেখানে রাধার রূপমুগ্ধ প্রণয়ী। অন্যদিকে শ্রীচৈতন্যের মধ্যে মূর্ত হয়েছিল রাধার ভাবতন্ময়তা। তাই চৈতন্যপরবর্তী যুগে কবিরা সমান আগ্রহের সঙ্গে কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁর

'নন্দনন্দন চন্দ চন্দন'

শীর্ষক পদটিতে কবি অনুপ্রাসের তরঙ্গিত হিল্লোলে কৃষ্ণের অপূর্ব রূপমাধুরী বর্ণনা করেছেন। নন্দনন্দন কৃষ্ণের অঙ্গ লাবণ্য ও সৌরভ, চন্দ্র এবং চন্দনকেও পরাজিত করে। তিনি মেঘের মতো সুন্দর, শঙ্খের মতো তাঁর গ্রীবা হস্তীর ভঙ্গি কেও হার মানিয়ে দেয়। গোকুলের গোপ যুবতীরা সবাই তাঁর প্রেমে আকুল। তিনি সবারই কান্ত। তাঁর বেতসকুঞ্জ মন্দির ফুলে ফুলে সুশোভিত। তাঁর গন্ডমন্ডলে কুন্ডল দুলছে। আর চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ উড়ছে। তিনি কেলিততান্ডবে তাল দেওয়ায় বিদগ্ধ। তার সুদৃঢ় বাহু, দন্ডের কাঠিন্যকেও পরাজিত করে। তাঁর দুটি চোখ কমলের মতো সুন্দর। তাঁর বাক্য কর্ণের তৃপ্তিদায়ক ও পাপ-বিনাশক। পল্লবের মতো সুন্দর ও কোমল তাঁর দুটি অমল চরণ ভক্ত গোবিন্দদাসের আশ্রয়স্থল। এই পদটি নিছক শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা নয়। রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী কুঞ্জমন্দিরের বর্ণনা এই রূপবর্ণনাকে পৃথক মাত্রা দান করেছে। কেলি-তান্ডবে পণ্ডিত এবং বিশাল সুদৃঢ় বাহুযুক্ত কৃষ্ণ চৈতন্যদেবের কথাও মনে করিয়ে দেন।

'শ্যাম সুধাকর ভুবন মনোহর'

শীর্ষক পদটিতেও কৃষ্ণের রমণীমোহন রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। শ্যামচন্দ্র সারা পৃথিবীর মানুষের মনকেই মুগ্ধ করেন।তাঁর সজল মেঘের মতো শরীর ঘনরসময়। তাঁর রূপ কোটি কোটি মদনকেও পরাজিত করে। আর স্থলকমলের পাপড়ির মতো তাঁর পদতল রক্তিম। সুন্দর নূপুরের কলধ্বনিতে তাঁর নখমণি রঞ্জিত। তিনি প্রেম পরিপূর্ণ অন্তরে অত্যন্ত মন্থরগতিতে পথ চলেন। তাঁর অধরে বংশীধ্বনি যেন কামিনীদের বশ করার জন্যে মদনের মন্ত্র, তিনি গুণের সাগর, অভিনব প্রেমিক। গোবিন্দদাসের মনে নিত্যই তাঁর জাগরণ। শুধু ব্রজবুলি ভাষায় নয়, সহজ সাবলীল বাংলা ভাষাতেও কবি তাঁর কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছেন। এই কৃষ্ণের গায়ের রঙ চিকন কালো। তাঁর গলায় মালা, তাঁর পায়ে নূপুর বেজে চলে। চূড়ার ফুলে ভ্রমর ঘুরে বেড়ায়। আর তিনি তির্যক চোখে দৃষ্টিপাত করেন। কৃষ্ণের সেই রূপ দেখে মুগ্ধা রাধা সখীর কাছে বলেন, তিনি আর ঘরে ফিরতে পারলেন না। তাঁর প্রাণ এই অপরূপ কৃষ্ণকে দেখে আকুল হল। তাঁর মাথায় ময়ূরপাখা বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। ঈষৎ হেসে তিনি মধুর সুরে মোহন বাঁশী বাজাচ্ছেন। রসের

প্রাচুর্য যেন তাঁর অঙ্গ ছাপিয়ে যাচ্ছে। তাঁর এই রূপ ও ভঙ্গি কুলবতী সতী এবং যুবতী নারীর প্রাণ নিয়ে খেলা করে। তাঁর কানে মকরাকৃতি কুণ্ডল দোলে। পরিধানে পীতবসন। গোবিন্দদাস তাঁর রক্তপদ্মের মতো দুটি চরণে শরণ নেন। ব্রজবুলি ভাষার পরিশীলিত সৌন্দর্য এখানে নেই। কিন্তু সহজ সাবলীল বাংলা ভাষায় প্রবহমানতা সৃষ্টির ক্ষমতাও যে গোবিন্দদাসের আয়ত্ত, কৃষ্ণের রূপবর্ণনার এই পদটি তারই প্রমাণ। কৃষ্ণরূপ দর্শনে রাধার প্রতিক্রিয়া এবং সাধারণভাবে যুবতীজনের মনে কৃষ্ণরূপের প্রভাব বর্ণনাতেও কবি ব্রজবুলির সমস্পর্ধী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কৃষ্ণরূপ বর্ণনার অন্যান্য পদেও কবির ভক্তহৃদয়ের একই প্রবণতা প্রকাশিত হয়েছে। কখনো কখনো বিশিষ্ট অলঙ্কার ব্যবহারে, সংহত ভাষায় ভাব প্রকাশে গোবিন্দদাস তাঁর কবিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর কৃষ্ণ নীলপদ্মানয়না রাধার দুচোখের কাজল এবং 'নাগরি-নারি-হৃদয়-ঘন-চন্দ'।

শ্রীরাধার রূপ বর্ণনাতে কবি প্রধানত অলঙ্কারশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। শ্রীরাধা যেন মূর্তিমতী শৃঙ্গার রস। কবি এই শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তাঁর মুখমন্ডলের শোভা শরতকালীন চন্দ্রের শোভাকে খণ্ডন করে, তাঁর মুখের স্মিতহাস্য শ্যামের মনোহর চিত্তকে হরণ করে নেয়। শ্যাম বিনোদিনী রাই আজ নতুন সাজে সেজেছেন। তাঁর প্রতিটি অঙ্গকে যেন শত শত অনঙ্গের যূথ সেবা করছে। তাঁর লাবণ্য বর্ণনা করা যায় না। তাঁর কবরীতে বকুল ফুল। তাতে ভ্রমর আকুল হয়েছে এবং মধুপান করে উতরোল হচ্ছে। তাঁর সব অলঙ্কার- কঙ্কণ, কিঙ্কিণী প্রভৃতি ঝংকৃত হচ্ছে। পদকমলের ওপর মণিময় নূপুর খঞ্জনের শব্দের মতো শব্দ করছে। তাঁর পদনখ যেন মণিময় দর্পণ। এই দর্পণ যেন স্বয়ং মননেরই। সেই দর্পণ সুপরিষ্কৃত করেন গোবিন্দদাস।

'জয়তি জয় বৃষভানু নন্দিনী'

শীর্ষক পদেও কবি শ্যামমোহিনী রাধার বন্দনা করেছেন। শতবার বিশোধিত করলে স্বর্ণের যে উজ্জ্বল কান্তি হয়, রাধার গাত্রবর্ণও তেমনি উজ্জ্বল। রাধার এই উজ্জ্বলতা লক্ষ্মীকেও পরাজিত করে। তাঁর সহজ প্রেমের ভঙ্গি শত শত মদনকেও মোহিত করে। মুখের মৃদুমন্দ হাসি কুন্দ কুসুমের মতো শুভ্র দন্তপংক্তিকে প্রকাশ করে। আর সেই হাসির সৌন্দর্য শত বিদ্যুতের ঝলকের মতোই উজ্জ্বল। এই সুন্দরী রাধা তাঁর রত্নগৃহের মাঝখানে

মুখ অর্ধাবৃত করে আছেন। গোবিন্দদাস সেই চরণের ধ্যান করে তাঁর কাছে প্রেম প্রার্থনা করেন। এইভাবে কবি উজ্জ্বলনীলমণি-র শ্রীরাধা-প্রকরণের দীপ্তিময়ী মহাভাবস্বরূপিণী রাধার সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

১০.২। ব্রজবুলিতে কৃতিত্ব

বিদ্যাপতির অনুগামী গোবিন্দদাস শুধু ব্রজবুলি ভাষারই শ্রেষ্ঠ পদ-রচয়িতা নন, ভাবের দিক থেকেও বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যহেতু তাঁকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্যরূপে অভিহিত করা হয়। দীর্ঘকাল পূর্বে কবি বল্লভদাসও এ বিষয়ে লিখে গেছেন-

'ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা

গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।

তাহা হৈতে নহে ন্যুন গোবিন্দের কবিত্বগুণ

গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।'

মিথিলার কবি বিদ্যাপতির রচনার ভাষা ও ভাবের সঙ্গে গোবিন্দদাসের রচনার ভাষা ও ভাবের সাদৃশ্যহেতুই যে বাইরের সমালোচকরা গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলে প্রচার করে থাকেন, তা নয়, স্বয়ং গোবিন্দদাসও অতিশয় সজ্ঞানেই বিদ্যাপতির অনুসরণ করতেন। বেশ কয়েকটি পদে বিদ্যাপতির সঙ্গে গোবিন্দদাসেরও ভণিতা পাওয়া যায়। 'পদামৃত-সমুদ্র' নামক প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী সঙ্কলনের সঙ্কলয়িতা রাধামোহন ঠাকুর এ থেকে অনুমান করেছিলেন যে বিদ্যাপতির অসম্পূর্ণ পদগুলির পূর্ণতা-সাধন করেছিলেন বলেই কবি গোবিন্দদাস তাতে যুগ্ম ভণিতা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন এই অনুমানের যৌক্তিকতায় আস্থা স্থাপন করতে না পেরে স্বয়ং অনুমান করেন, "গোবিন্দদাস কতকগুলি পদ বিদ্যাপতির পদের প্রত্যুত্তর-স্বরূপ রচনা করিয়াছিলেন এবং সেইগুলিতে তিনি বিদ্যাপতির নাম করিয়া গিয়াছেন।" আবার কেউ কেউ অনুমান করেন যে, গেবিন্দদাস বিদ্যাপতির ত্রিচরণপদের চতুর্থ পদটি পূরণ করেছেন:

'বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব

গোবিন্দদাস রসপুর।'

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে, শ্রীখণ্ডের কবি কবিরঞ্জন ছিলেন 'বিদ্যাপতি' উপাধিধারী।তাঁকে 'ছোট বিদ্যাপতি' নামে অভিহিত করা হয়। এঁর ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বহু পদই বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত রয়েছে। গোবিন্দদাস ব্রজবুলি ভাষায় যে সকল পদ রচনা করেছেন তাদের ভাষা অবিমিশ্র ব্রজবুলি; অন্য অনেকের রচনার মতো তাঁর রচনায় বাঙলা ভাষার মিশ্রণ ঘটেনি। গোবিন্দদাস তদ্ভব শব্দের ব্যবহার করেছেন অপেক্ষাকৃত কম। তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের সংখ্যাই বেশি।

১০.৩। আঙ্গিক নির্মাণ ও সঙ্গীত প্রবণতা-নাটকীয়তা-চিত্রময়তায় শ্রেষ্ঠত্ব

কবিতার আঙ্গিক তথা বহিরঙ্গের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, সমালোচকগণ গোবিন্দদাস কবিরাজকে বৃথাই শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা দান করেন নি। ভাষায় ছন্দে ও অলঙ্কার আঙ্গিকে শ্রেষ্ঠত্ব ব্যবহারে গোবিন্দদাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ভাষার স্থাপত্যশিল্পে গোবিন্দদাসের দক্ষতা অতুলনীয়। পদের লালিত্য, ছন্দের ঝঙ্কার ও অলঙ্কারের সুষ্ঠু প্রয়োগে বিদ্যাপতি-শিষ্য গোবিন্দদাস স্বীয় গুরু বিদ্যাপতির সার্থক উত্তরসূরী । তাঁর রচনার প্রধান গুণ যে শ্রুতিমাধুর্য, তা কবি নিজেও উল্লেখ করেছেন-

'রসনা রোচন শ্রবণ বিলাস।

রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস ॥'

গোবিন্দদাসের পদ বিচার করে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, "ইহার লেখায় ছন্দের বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। অনুপ্রাসের ও উপমা রূপকাদি অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ কবিরাজের মত আর পদকর্তাই করিতে পারেন নাই। শব্দের ঝঙ্কারে এবং পদের লালিত্যে কাবিরাজের গীতিকবিতাগুলি বাঙলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।"

ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কারের বাইরে গোবিন্দদাসের রচনার আর একটি বড় গুণ- সঙ্গীতময়তা। এখানে তিনি বিদ্যাপতির শিষ্য নন, তিনি বৈষ্ণব কবিতার আদি পুরুষ জয়দেব গোস্বামীর

কাছ থেকেই যেন সুরের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন। কোন কোন বিদগ্ধ সমালোচক মনে করেন, সূক্ষ্ম সঙ্গীতবোধ তথা কাব্যের সুর-চেতনা একান্তভাবেই বাঙালীর নিজস্ব, ভারতের অন্যত্র এ বস্তু সহজপ্রাপ্য নয়।

গোবিন্দদাসের রচনার আরও বিশেষ গুণ হল নাটকীয়তা ও চিত্রধর্মিতা। বিভিন্ন পর্যায়ের যে নাটকীয়তা ও চিত্রমরতা সমস্ত পদে গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব সন্দেহাতীত, সে সমস্ত পদেই এই দুটি গুণের কোন একটির উপস্থিতি অবশ্যই লক্ষ্য করা যায়, কখন কখন এদের যুগপৎ উপস্থিতি কাব্যসৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়।

এই সমস্ত গুণাবলীর কারণে গোবিন্দদাসের পদগুলি বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে এবং সর্বকালের কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাসের স্থানও উচ্চেই অবস্থিত।

১০.৪। গোবিন্দদাসের পদে ছন্দ ও অলংকার

ব্রজবুলি ভাষা বৈষ্ণপদাবলীর অমূল্য সম্পদ। ব্রজবুলি ভাষায় পদরচনা আসাম, ওড়িশা এবং বাংলাদেশে প্রায় একই সময়ে শুরু হয়েছে। তুলনায় মিথিলা অঞ্চলে কিছুটা আগেই শুরু হয়েছে। সুকুমার সেন বলেছেন ব্রজবুলির উদ্ভব ও বিকাশ নেপাল, তীরহুত-মোরঙ্গের রাজসভায়। কথ্যভাষা অপভ্রষ্টের সাহিত্যিক রূপ অবহট্ট থেকে বিবর্তিত হয়ে জন্ম নিয়েছে ব্রজবুলি ভাষা। সুকুমার সেন বলেছেন, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে যখন থেকে রূপ গোস্বামী নির্দিষ্ট সূত্র অনুসারে পদাবলী রচনা শুরু হয় তখন থেকে অধিকাংশ পদকর্তার ঝোঁক পড়েছিল ব্রজবুলির ওপর। ব্রজবুলির শব্দ, অন্বয়, বাগবিধি ও ছন্দ অবহট্ট থেকে মৈথিলি ভাষায় গৃহীত হয়ে পরে তা বাংলা দেশে প্রচলিত হয়েছিল। এই ভাষার ঠাট বাঙালি পদকর্তাদের কাছে মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলের হিন্দির মতো মনে হতো। এই ভাষার নাম তাই ব্রজবুলি। ব্রজবুলি একান্ত ভাবেই সাহিত্যের ভাষা। বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করে গোবিন্দদাস এই ভাষাতেই তাঁর অধিকাংশ পদরচনা করেছেন।

ব্রজবুলিতে রচিত পদের আর একটি প্রধান ছন্দ প্রাকৃতদীর্ঘ ত্রিপদী। এই ছন্দের প্রত্যেক চরণের প্রথমাংশ পজ্ঝটিকা। প্রত্যেক চরণের প্রথমার্ধ প্রাকৃতের মরহট্টা বা চউপাইআর

মতো ৮ + ৮ মাত্রা কিংবা নরেন্দ্রবৃত্তের মতো ৭+৯ মাত্রার গঠিত। বৈষ্ণব কবিরা ছন্দোহিল্লোল সুরবৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যই উভয়বিধ চরণের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ৮+৮+৮+৪ অথবা ৩ মাত্রা হয়েছে মিশ্রণের ফলে। যেমন-

রজনি কাজর বম / ভীম ভূজঙ্গম / কুলিশ পড়য়ে দুর / বার

গরজ তরজ ঘন / রোষে বরিষছান / সংশয় পড় অভি/ সার (গোবিন্দদাস)

বৈষ্ণব কবিরা সুবিধামতো কখনও দীর্ঘস্বরকে দুমাত্রা ধরেছেন- কখনও একমাত্রা ধরেছেন। প্রয়োজনে হ্রস্বস্বরকে কোথাও কোথাও দুমাত্রা ধরেছেন।

প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদীর শেষের পর্বটিতে ৩ বা ৪ মাত্রার বদলে ৬, ৭ বা ৮ মাত্রা থাকলে তাকে প্রাকৃত দীর্ঘ চৌপদী বলা যায়। যেমন-

৮ ৮ ৮ ৬

গোবিন্দ দাস চিতে / নিতিনিতি বিহরই /হই নাগর বর / তরুণ তমাল।।

পাঁচ মাত্রার ছন্দে জয়দেবের অনুসরণ আছে। যেমন-

বদলি যদি / কিঞ্চিদপি/দন্তরুচি/কৌমুদী (শিখা ছন্দ)

বৈষ্ণব পদাবলীতে অলঙ্কার ব্যবহারের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বিবিধ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

শ্লেষ- পূজহ পশুপতি নিজ তনুদান

ভ্রান্তিমান- রাই রাই করি সঘনে জপয়ে হরি

তুয়াভাবে তরু দেয় কোর।

ব্যতিরেক- চম্পক শোন কুসুম কনকাচল

জিতল গৌর তনু লাবণিরে।

ভ্রান্তি- হরি হরি বোলি ধরণি ধরি উধই বোলত গদগদ ভাখ।

নীল গগন হেরি তোহারি ভরমভরে বিহিসবেও মাগয়ে পাখ।।

বিশেষোক্তি- হৃদয় বিদারত মনমথ বাণ কো জানে কাহে নহত দুই ধাম।

জলু বিরহানল মন সাহা গোয়। কঠিন শরীর ভসম নাহি হোয়।।

ব্যাজস্তুতি- ভাল ভেল মাধব তু দূর।

অযতনে ধনিক মনোরথ পূর্ব।।

বৈষ্ণব পদাবলীর কবিরা সকলে সচেতনভাবে যে এগুলি ব্যবহার করেছেন তা নয়। সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়োজনে তাঁদের অনুভূতিকে কাব্যরূপ দেওয়ার প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই অলঙ্কারগুলি এসেছে। কিন্তু সব সময় একথা সত্য নয়। কিছু কিছু পদে অলঙ্কার ব্যবহারে কৃত্রিমতাও লক্ষ করা যায়।

গোবিন্দদাস চর্চরী ছন্দ ও দীর্ঘ চৌপদী ব্যবহার করেছেন।

(১) চর্চরীর নিদর্শন- ৩: ৪/৩ : ৪

নন্দ নন্দন | চন্দঃ চন্দন || গন্ধঃ নিন্দিত | অঙ্গ ||

জলদঃ সুন্দর | কন্ধুঃ কন্ধর || নিন্দিঃ সিন্ধুর || ভঙ্গ ||

(২) ষন্মাত্রিক ছন্দ- ৬।৬ || ৬ || ৬

শিথিল ছন্দ | নিবিক বন্ধ ॥

বেগে ধাওত | যুবতি বৃন্দ॥

উৎপেক্ষা, রূপক, ব্যতিরেক অলঙ্কারে, নিদর্শনায় গোবিন্দদাস অনন্য । মালা নিদর্শনার নিদর্শন-

‘যাঁহা যাঁহা নিকসায় তনু তনু জ্যোতি।

তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি ॥’

১০.৫। গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতির তুলনা

গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির কবিশিষ্য বলা হয় নানা কারণে। উভয়ের কাব্যেই শব্দের ঝঙ্কার, ছন্দের দোলা এবং অলঙ্কারের প্রচুর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। উভয়েই রূপমুগ্ধ কবি। কবি বল্লভদাস সমকালীন মানুষের মনোভাবকে বুঝে নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন-

ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা

গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।

তাহা হৈতে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্ব গুণ

গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।।

কবিশিষ্য বলতে কেবল শব্দঝংকার, ছন্দ এবং অলঙ্কারই বোঝায় তাহলে হয়তো গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির শিষ্যত্ব দেওয়া যায়। কিন্তু কবিত্বে ছন্দ-অলংকার-ঝংকার নিতান্তই বাহ্য ব্যাপার। ভাবের রসে পরিণতই কবিত্ব, তা হলে গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির শিষ্যত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। বিদ্যাপতি ছিলেন রাজসভার কবি, তিনি নিজে বৈষ্ণবও ছিলেন না। রাধাকৃষ্ণকে তিনি শৃঙ্গার রসমূর্তি বলেই গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর কাব্যে তাই লৌকিক প্রেমচিত্রই পাওয়া যায়। একথা ঠিক যে লৌকিক প্রেমও এক সময় গাঢ়তা পেয়ে অধ্যাত্ম স্তরে উন্নীত হতে পারে কিন্তু তা হলেও তা লৌকিকই। তাই বিদ্যাপতির রূপানুরাগ ছিল প্রবল- এ সম্বন্ধীয় পদে অলংকরণের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। বিদ্যাপতি রাধার মধ্যে দিয়ে নারীর রূপ উপভোগ করেছেন; তাই কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা সেই দেহগত ভাবের প্রাধান্য। চৈতন্যোত্তর কালের মহাজনগণ কৃষ্ণরূপের বর্ণনা করেছেন নানাভাবে।

রূপের বর্ণনায় বিদ্যাপতি সংস্কৃত আলঙ্করিক এবং বাৎস্যায়নের দ্বারা প্রভারিত। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু দেখিয়েছেন যে, বিদ্যাপতির রাধারূপ বর্ণনার পদগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়- (১) আলঙ্কারিক কলাচাতুর্যের পদ, (২) দেহের সর্বাঙ্গের বর্ণনামূলক পদ, (৩) বিশ্রস্তবাস দেহের কিংবা অরক্ষিত দেহের সৌন্দর্য এবং (৪) স্নানমূলক পদ। পদবিভাগ থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, কোথাও রাধাকে দেবী বা হ্লাদিনী শক্তি বলে গ্রহণ করেন নি বিদ্যাপতি, অথচ গোবিন্দদাসের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক রূপানুরাগের পদে কি

ভাবগভীরতার নিদর্শনই না পাওয়া যায়- কৃষ্ণের রূপ যেন মাটির পৃথিবীর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগহীন-

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি

অবনী বহিয়া যায়।

ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোল

মদন মুরছা পায়।।

যে অঙ্গের লাবণ্য 'অবনী বহিয়া যায়' সে অঙ্গ কি দিয়ে নির্মিত? পৃথিবীর সামগ্রী তো কিছুতেই নয়, তাঁর সামান্য হাসির হিল্লোলে কামনার অবসান। এ বিগ্রহ তো ভাবজগতের।

রাধার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কৃষ্ণের যে ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন গোবিন্দদাস, তার স্বাদ বিদ্যাপতি পাননি-

কোমল চরণ চলত অতি মন্থর

উতপত বালুক বেল।

হেরইতে হামারি সজল দিঠি-পঙ্কজ

দুই পাদুক করি নেল।।

এ মূর্তি দেবীর; কিছুমাত্র কামনা জাগায় না। উত্তপ্ত বালুকা রাশির ওপর দিয়ে রাধা সখীদের নিয়ে কালিন্দী নদীতে স্নানে চলেছেন- বালুকার উত্তাপে তার গতি মন্থর কৃষ্ণের হৃদয় অস্থির হয়ে উঠেছে- রাধার চরণপদ্মের তলায় পাদুকারূপে তাঁর সজল চোখ দুটো পেতে দেবার ব্যাকুলতায় তিনি বিভোর। কৃষ্ণের এই আত্মসমর্পণ গোবিন্দদাসেরই।

মান-এর পদে বিদ্যাপতি উৎকর্ষ দেখালেও চৈতন্যোত্তর কালের মহাজনদের মানের পদের সঙ্গে তুলনা চলে না। বঙ্গদেশে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির কয়েকটি মানের পদে যে নিরবতা দেখা যায় তা কীর্তনীয়দের কল্যাণেই রূপান্তরিত হয়েছে বলেই অধ্যাপক বসু মনে করেন।

কাব্যের বহিরঙ্গের একটা কথা এখানে স্মরণীয়; কাব্যে সুর সৃষ্টিতে গোবিন্দদাস জয়দেবের কাছে ঋণী বিদ্যাপতির কাছে নন। ছন্দ বিষয় বিদ্যাপতির কাছে গোবিন্দদাসকে ঋণ স্বীকার করতেই হবে কিন্তু সুর সৃষ্টিতে বিদ্যাপতি অনেক পেছনে।

অভিসারের পদে গোবিন্দদাসই প্রধান, বিদ্যাপতি তাঁর পরে। অধ্যাপক বসু বলেছেন, 'গোবিন্দদাস দ্বিতীয় বিদ্যাপতি- কিন্তু, অভিসারে অদ্বিতীয়- বিদ্যাপতিরও উর্দে।' অবশ্যই স্বীকার্য যে, বিদ্যাপতির অভিসার বর্ণনায় অনেক বৈচিত্র্য আছে। তাঁর রাধিকার অভিসার হয়েছে বিচিত্র পরিবেশে। গোবিন্দদাসও অবশ্যই দিবাভিসার, তিমিরাভিসার, বর্ষাভিসার প্রভৃতির ভিতর দিয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন কিন্তু বিদ্যাপতিতে যে জীবনের পরিচয় আছে গোবিন্দদাসে তা নেই। বিদ্যাপতির রাধা পার্থিব নায়িকা বলেই তা জীবন অনুসারী- গোবিন্দদাসের রাধা এ জগতের নয়। এই কারণেই আবার গোবিন্দদাসের পদ অনেক শোভন এবং পরিস্ফুট। গোবিন্দদাসের রাধা লোকজগতের নয় বলেই বিচিত্র নয়; বিদ্যাপতির অভিসারিকা রাধা প্রেমের দেহগত স্তর থেকে ক্রমেই গভীরতা লাভ করায় বিচিত্র্য, তা সত্ত্বেও বিদ্যাপতির রাধার অভিসার লৌকিক জগতের নায়িকারই অভিসার- বিভিন্ন সময়ে হয়তো তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু সে এ জগতের প্রেমাস্পদের জন্যেই অভিসারিকা হয়েছে। "গোবিন্দদাসের রাধার অভিসার মানবাত্মার চিরন্তন অভিসার যাত্রা, এই অভিসারের জন্যে অপেক্ষা করে থাকেন সব দুঃখহর হরি- তিনি সেবা করেন মানবাত্মাকে। গোবিন্দদাসের অভিসার পদের অন্যতম প্রেরণাও তাহাই। অর্থাৎ এক কথায় 'চরৈবেতি' মন্ত্রের সিদ্ধি প্রতিমার রূপাঙ্কন। তাই গোবিন্দদাসের অভিসার যেন প্রতীক অভিসার, তাহা উৎকৃষ্ট ধর্মগীতি।" বিদ্যাপতির অভিসার ব্যক্তিভাবনা-জাত, গোবিন্দদাসের অভিসার গোষ্ঠীভাবনা সঞ্জাত। বিদ্যাপতির রাধা প্রায়শঃ সচেতন, সতর্ক। গোবিন্দদাসের রাধা সর্বদাই আত্মবিস্মৃত, সমর্পিত। এখানেই বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসের বিশেষ পার্থক্য।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাস উভয়েই বিদগ্ধ, কলাকুশলী এবং লোকাত্তর প্রতিভার অধিকারী। বিদ্যাপতির প্রতি গোবিন্দদাসের যে একটা আকর্ষণ ছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়। বিদ্যাপতির ত্রিচরণ পদের চতুর্থপাদ পূরণ করে তিনি পূর্ণাঙ্গ

কাব্যরূপে গড়ে তুলেছেন। উভয়ের যুক্ত ভণিতাযুক্ত পদও আছে। কিন্তু যুগের পার্থক্য উভয়ের কাব্যভাবে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। প্রাক্-চৈতন্যযুগের বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে চৈতন্যোত্তর রাধাকৃষ্ণের এক বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। রাজসভার কবির সঙ্গে অধ্যাত্ম জগতের ভক্ত কবির পার্থক্য না ঘটাটাই হতো অস্বাভাবিক।

বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়াও রচনা করেছেন শিববিষয়ক পদ, ঐতিহাসিক কাব্য - প্রভৃতি। এ থেকে বোধগম্য হয় যে তিনি গোবিন্দদাসের মত বৈষ্ণবভাবে বিভোর থাকতেন না। অন্যদিকে, গোবিন্দদাস বিচিত্র বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন আরাধ্য রসামৃত মাধুরীর বিগ্রহ রাধাকৃষ্ণকে দেখে। গোবিন্দদাসের ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলি চৈতন্যোত্তর কালে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হত, সম্ভবত তাকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলার অন্যতম কারণও এটা। কিন্তু সর্বত্রই গোবিন্দদাসের স্বকীয়তা প্রকাশিত। যেখানে তিনি বিদ্যাপতির পদের অনুসরণ করেছেন সেখানেও তিনি সৃষ্টি করেছেন। বিদ্যাপতি বলেছেন-

যাহাঁ যাহাঁ পদযুগ ধরই।

তাহাঁ তাহাঁ সরোরুহ ভরই।।

ঐ একই বক্তব্য গোবিন্দদাসের পদে-

যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।

তাহাঁ তাহাঁ বিজুরি চমকময় হোতি।।

বক্তব্য এক হলেও গোবিন্দদাসের পদ শ্রেষ্ঠতর, তাঁর চিত্রণও অধিকতর স্পষ্ট- রাধা এখানেও যথেষ্ট গতিশীল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বৈষ্ণব পদাবলীর ভূমিকায় উভয়ের তুলনা করে বলা হয়েছে- "বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস দুই জনেই পণ্ডিত কবি- রসশাস্ত্রে ও অলঙ্কার শাস্ত্রে দুজনেরই অসামান্য পাণ্ডিত্য। পার্থক্য এইটুকু যে গোবিন্দদাস রস সম্পর্কে রূপ গোস্বামীর অনুগত এবং বিদ্যাপতি দন্ডী প্রভৃতির সহিত বাৎস্যায়নেরও অনুগত। দুজনেই প্রকাশভঙ্গি বিভিন্ন- বিদ্যাপতি তরল, গোবিন্দদাস যাস্ত্র।" বিদ্যাপতি অবশ্যই পরবর্তীকালে তরলতা

উত্তরণ করেছিলেন। অলংকার প্রয়োগে দুজনেরই বিশেষ ঝোক ছিল বটে কিন্তু একই ধরনের অলংকারের দিকে দুজনের দাবি ছিল না। বিদ্যাপতির আমলে মৃদঙ্গের রেওয়াজ ছিল না। উক্ত ভূমিকায় আরো বলা হয়েছে- "বিদ্যাপতির রাধা চলিয়াছে সহজ হৃদয়ের ধর্মের পথে এবং গোবিন্দদাসের রাধা চলিয়াছেন কঠিন দার্শনিকতার পথে। বিদ্যাপতির রস তরুণ, গোবিন্দদাসের প্রৌঢ়। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও দুজন দুই প্রকৃতির। বিদ্যাপতি ভক্ত নহেন, কবি, গোবিন্দদাস যত বড় কবি, ততধিক ভক্ত।"

প্রাক-চৈতন্যযুগের কবি বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদে বৈষ্ণব ভাবনার কোনও চিহ্নই নেই, কিন্তু গোবিন্দদাসের পদে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব তার স্বাভাবিক স্থান অধিকার করে নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর বক্তব্য হল- "চৈতন্যজীবন ও চৈতন্য উত্তর বৈষ্ণব সাধনার সমস্ত ঐতিহ্যটিকে স্বীকার করে নিয়ে সেই ঐতিহ্যের প্রতীক রূপেই যেন গোবিন্দদাস কাব্যরচনার ব্রতী হয়েছেন।" ফলে, ভাব-ভাষা চিন্তা উপলব্ধি এবং উপভোগের বিস্তার বৈচিত্র্যভারে তাঁর কবি প্রতিভা হয়ে উঠেছিল পরিপূর্ণ গোবিন্দদাসের পদাবলীতে ব্যক্তিকবির বাণীকে ছাপিয়ে একটি সমগ্রযুগের যৌথ সাধনা যেন কথা বলে উঠেছে- তাঁর রচনা একটি যুগের সামগ্রিক সাধনা ও উপলব্ধির বাঙ্ময় প্রকাশ। এখানেই গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতির মৌলিক পার্থক্য। বিদ্যাপতির পদে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিমানসের শৈল্পিক প্রকাশ, আর গোবিন্দদাসের রচনায় বৈষ্ণতত্ত্বের যুগব্যাপী ও যুগসাধনার সুষমাময় সামগ্রিক অভিব্যক্তি।

বৈষ্ণবভক্ত কবিগণ কান্ত বা মধুরসকে শ্রেষ্ঠ রস বলে মনে করেন। আর এই রসমূর্তির অধিকারী কৃষ্ণকে মনে করেন 'শৃঙ্গার রসরাজময় পূর্ণ মূর্তি।' সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যেই এই মধুর রসেরই জয়গান। মধুর রসকে অবলম্বন করেই বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, আক্ষেপানুরাগ, বিরহ, মাথুর, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি পর্যায়ের অপূর্ব সব পদাবলী রচিত হয়েছে। বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বিখ্যাত পদকর্তা মধুর রসকে কেন্দ্র করেই তাঁদের কাব্য প্রতিভাকে উজাড় করে দিয়েছেন।

মন্তব্য

১০.৬। অনুশীলনী

১। গোবিন্দ দাসের পদে রাধা ও কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা আলোচনা করুন।

২। ব্রজবুলি ভাষায় গোবিন্দ দাসের কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। আঙ্গিক নির্মাণ, সংগীত প্রবণতা, নাটকীয়তা ও চিত্রময়তায় গোবিন্দ দাসের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পর্যালোচনা করুন।

৪। গোবিন্দদাসের পদে ছন্দ ও অলংকারের সফল্যতা বিচার করুক।

৫। গোবিন্দ দাস ও বিদ্যাপতির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

১০.৭। গ্রন্থপঞ্জি

১। গোবিন্দদাসের পদাবলী : বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

২। পাঁচশত বৎসরের পদাবলী : বিমান বিহারী মজুমদার

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১-৩ খন্ড) : ড.অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। বৈষ্ণব পদাবলী : ড. সত্য গিরি

৫। বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় নবপর্যায় : নীলরতন সেন

৬। বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস (২-৩ খন্ড) : ড. সুকুমার সেন

একক: ১১ : চৈতন্য ভাগবত: স্থান-কাল প্রেক্ষিত প্রসঙ্গ

বিন্যাসক্রম

১১.১। উদ্দেশ্য

১১.২। বৃন্দাবন দাসের কাল

১১.৩। ষোড়শ শতকের তৎকালীন রাঢ়বঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

১১.৪। ষোড়শ শতকের তৎকালীন রাঢ়বঙ্গের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

১১.৫। ষোড়শ শতকের তৎকালীন রাঢ়বঙ্গের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট

১১.৬। অনুশীলনী

১১.৭। গ্রন্থপঞ্জি

১১.১। উদ্দেশ্য

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এক অভিনব যুগান্তকারী ঘটনা। মাত্র আটচল্লিশ বছরের জীবনে পূর্ণতম মানবসত্তার সকল দিকই তিনি প্রকাশ করে গেছেন এবং সমগ্র মানবজাতিকে এক মহৎ জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত করেছেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান কখনও শেষ হবার নয়।

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ- এই চতুবর্গ ফলের বাইরেও যে মানুষের কিছু চাওয়ার থাকতে পারে- সেই আধ্যাত্মিক উত্তুঙ্গতার হদিশ তিনিই আমাদের প্রথম জানালেন। দাক্ষিণাত্য

গমনকালে রামানন্দের সঙ্গে ‘সাধ্য-সাধন’ আলোচনায় সেই প্রথম এই তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া গেল। রায় রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন-

বিদ্যা মধ্যে কোন্ বিদ্যা সার।

রায় কহে - কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।।

শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যাপক ও রহস্যময় সুগভীর জীবনকে অবলম্বন করে জীবনীগ্রন্থ রচনা করা দুঃসাধ্য হলেও, সেই কঠিন কাজটি বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থকভাবে করেন শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর। তাঁর ‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’, শ্রীচৈতন্যজীবনীর প্রথম দিগদর্শন। যতদিন পর্যন্ত বাঙালির সংস্কৃতিমনস্কতা, আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা থাকবে- ততদিন পর্যন্ত এই গ্রন্থেরও অবদান উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তাই এই একক রচনার মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত’ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও স্বচ্ছ ধারণা জন্মানোই লক্ষ্য।

১১.২। বৃন্দাবন দাসের কাল

বৃন্দাবন দাস ষোড়শ শতাব্দীর কবি। কবির আবির্ভাবকাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য না থাকলেও আনুমানিক ১৫১৮-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তাঁর জন্ম - অনেক সমালোচকই এই মত পোষণ করেন।

বৃন্দাবন দাসের জন্ম শ্রীচেতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পর। শ্রীচৈতন্যদেব প্রকট থাকাকালীন বৃন্দাবনের জন্ম হলেও শ্রীচৈনত্যদেবের সঙ্গে তাঁর কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। এইজন্য তিনি নিজেকে ‘পাপিষ্ঠ’ও বলেছেন। কাতরোক্তি করেছেন- ‘হইলাঙ বঞ্চিত সে সুখ দরশনে’।

শ্রীচৈন্যদেবের দর্শন, স্পর্শন, সান্নিধ্যে সুখ থাকলেও তাঁর সমকালটি মোটেও সুখের ছিল না। সমাজের নানা জগদ্দল বাধাকে অতিক্রম করেই তাঁকে এগোতে হয়েছে পদে পদে।

‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’-এ বৃন্দাবন দাসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা বর্ণনা, কিন্তু খুব সংগত কারণেই সেই লীলা বর্ণনের পাশাপাশি উঠে এসেছে তৎকালীন রাঢ়বঙ্গের

রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং ধর্মনৈতিক সংঘর্ষ ও পরিবর্তনের ইতিহাস। এতে তাঁর বাস্তব সমাজ-অভিজ্ঞতা এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় মেলে।

১১.৩। ষোড়শ শতকের তৎকালীন রাঢ়বঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

বৃন্দাবনের বর্ণনা অনুসারে সেকালের নবদ্বীপ ছিল এক সমৃদ্ধশালী নগর- 'নবদ্বীপ হেন গ্রাম নাঞি ত্রিভুবনে'। তথাপি সে নবদ্বীপে ছিল আত্মঅহংকার, ভগবদভক্তিবিমুখ ঐহিক সুখের আতিশয্য। কেবল গুটিকয় ভক্তিপ্রাণ কৃষ্ণভক্ত হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে ভগবদভক্তিধারাকে প্রবাহিত রেখেছিলেন, যাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য।

এই সময় অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বে অত্যাচারী হাবসি খোজার (পাঠান) ধর্মদ্বেষী অপশাসনে রাঢ়বঙ্গ ছিল সন্ত্রস্ত। বৈষ্ণবদের প্রতি সাধারণ মানুষের ব্যবহার ছিল অসম্মানজনক, আক্রমণাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক-

'কেহো বলে যদি ধান্যে কিছু মূল্য চড়ে।

তবে এগুলারে ধরে কিলাইমু ঘাড়ে।।'

সে সময় মুসলমান কাজি কিংবা মুলুকপতির ধর্মীয় গোঁড়ামি জনিত বিদ্বেষ, পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট ছিল। মূলত কাজি বা মুলুকপতিকে তুষ্ট করতে কিংবা এদের আনুকূল্য লাভের আশায় অনেক হিন্দুধর্মাবলম্বীও বৈষ্ণববিদ্বেষী আচরণ করে হীন মজা আস্বাদন করত।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের (১৪৮৬ খ্রি.) পর রাঢরবঙ্গে এই ধর্মান্ধতার রূপটি বহুলাংশে সংকুচিত হয়। আনুমানিক ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে হুসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে বসার পর হিন্দু-বিদ্বেষ অর্থাৎ ধর্মীয় গোঁড়ামি তেমন বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছোয়নি। একমাত্র হুসেন শাহের ওড়িশা আক্রমণে হিন্দুমন্দির ধ্বংসের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর তেমন হিন্দু বিদ্বেষের দৃষ্টান্ত মেলে না।

গৌড় অধিপতি হুসেন শাহ ছিলেন উদার প্রকৃতির। মূলত তাঁর উদারতার জন্য শ্রীচৈতন্যদেবসহ সকল বৈষ্ণবগণ অবাধে এবং নিরুদ্বিগ্নে নামসংকীর্তন করতে পেরেছিলেন। নবদ্বীপের ভারপ্রাপ্ত শাসক ছিলেন হুসেন শাহের গুরু চাঁদ কাজি। তিনি বৈষ্ণব তথা সংকীর্তন-বিরোধী ছিলেন, এমনকি সংকীর্তনে নিষেধাজ্ঞাও জারি করেছিলেন। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন-

'যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।

ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে।।

কাজি বোলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।

করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া॥'

যদিও শেষ পর্যন্ত কাজি প্রবল জনবিপ্লবের রোষে ভয়ে ভীত হয়ে সংকীর্তন-বিদ্বেষ ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্যের আনুগত্য স্বীকার করেন।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে রাঢ়বঙ্গে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল। হুসেন শাহের আমলে তা ক্রমশ স্থির হতে থাকে। তাঁর উৎসাহ ও আনুকুল্যে বহু হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে সর্বসাধারণীকৃত হয়ে ওঠে। বৃন্দাবন তাঁর গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তি প্রকাশ ও প্রচারের পাশাপাশি তৎকালীন মুসলমান শাসকদের ধর্মীয় গোঁড়ামি, হিন্দু বিদ্বেষ, অত্যাচার-নিপীড়ন, পাশাপাশি হুসেন শাহের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও উদারতার পরিচয় জ্ঞাপন করে সেকালের স্পষ্ট রাজনৈতিক ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

১১.৪। ষোড়শ শতকের তৎকালীন রাঢ়বঙ্গের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

বৃন্দাবন দাস তাঁর "চৈতন্যভাগবত" গ্রন্থে কেবল শ্রীচৈতন্যের জীবনলীলাই বর্ণনা করেননি; নবদ্বীপকেন্দ্রিক বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ইতিহাসের মাধ্যমে ষোড়শ শতকের রাঢ়বঙ্গের আর্থ-সামাজিক চালচিত্রের ও স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। অন্যান্য চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির সঙ্গে চৈতন্যভাগবত-এর এটাই প্রভেদ।

বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ইতিহাসকে প্রতিকূল ও অনুকূল সামাজিক সংঘর্ষের পটভূমিকায় দাঁড় করিয়ে ক্রমবিবর্তিত শ্রীচৈতন্যের স্বরূপকে বৃন্দাবন দাস অতি সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ফলে 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটি কেবল শ্রীচৈতন্যের জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীর বর্ণনা বা তালিকা মাত্র হয়ে ওঠেনি- হয়ে উঠেছে দিব্যভাব পুষ্ট এক 'নরনারায়ণের' বিশ্বাসযোগ্য কাহিনি।

বৃন্দাবন দাস সমাজমনস্ক কবি। তাঁর সুক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তিতে তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ মূর্ত হয়ে উঠেছে। তখন নবদ্বীপ ছিল একাধারে বাণিজ্যকেন্দ্র এবং বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান। তখন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল। সেন রাজাদের আমল থেকেই গঙ্গার দুপাশে জমি ও অর্থের প্রতিপত্তিতে কুলীন ব্রাহ্মণেরা যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পন্ডিতেরা নবদ্বীপে এসে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ধর্মচর্চায় কাল কাটাতেন। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন-

'নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে।

একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥

ত্রিবিধ বসয়ে একো জাতি লক্ষ লক্ষ।

সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ॥'

কী অর্থে, কী বিদ্যায় বা বিদ্যানুশীলনে নবদ্বীপ হয়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের অন্যতম পীঠস্থান। তাই 'নবদ্বীপ হেন গ্রাম নাঞি ত্রিভুবনে'। তবে এর পাশাপাশি বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপের মানসিক দৈন্যতায় দীর্ণ 'ব্যবহার-রসে' মত্ত আত্মঅহংকারী ভোগপরায়ণ অন্ধকারের ছবিও তুলে ধরেছেন। 'ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে', 'ধন নষ্ট করে কেহ পুত্র কন্যার বিভায়', 'মদ্য-মাংস দিএ কেহ যক্ষপূজা করে' কিংবা

'বুলিলেও কেহ নাহি ল়য় কৃষ্ণনাম।

নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যখ্যান।।'

এইসকল উক্তির মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যবহারিক লাভালাভ, ভোগাসক্তি, বাহ্যাম্বর প্রিয় আত্মসুখপরায়ণ ভক্তিবিমুখ ধর্মহীনতার ছবিটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। এমনকি ব্রাহ্মণ ও উচ্চ শ্রেণির মধ্যেও কৃষ্ণ-বিষ্ণু ভক্তির সামান্যতম আচার-আচরণ ছিল না। সমাজে ঐহিক সুখভোগের জন্য বিভিন্ন দেবদেবী পূজার প্রচলন ছিল।

বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত' সমাজে বিভিন্ন বর্ণেরও বৃত্তিধারী শ্রেণির উল্লেখ করেছেন। যেমন- ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রমুখ উচ্চ বর্ণের মানুষ ছাড়াও কুমোর, গন্ধবণিক, তাঁতি, মালাকার, গোয়াল, তাম্বুলী, শঙ্খবণিক প্রমুখ। কবির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সমকালে ব্যবহৃত নানা রঙের কার্পাস ও পট্ট বস্ত্রসহ বিচিত্র গন্ধদ্রব্য, ধাতু নির্মিত ঝারি পানের বাটা প্রভৃতি সাধারণ মানুষের নিত্যব্যবহার্য তৈজসপত্রাদির পরিচয়। নরনারীর প্রসাধন রীতি, বিবাহের অধিবাসে অনুসৃত রীতি বিষয়ক নানা সামাজিক লোকাচার ও কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। সেকালে দিব্য-গন্ধ আমলকির সাহায্যে কেশ সংস্কার করা হত, মেয়েদের মত পুরুষেরাও দীর্ঘ কেশ রাখত, নিষ্ক্রামণ সংস্কার ও বিবাহের অধিবাসে আমন্ত্রিতদের খই, কলা, তেল, সিন্দুর, পান, সুপারি, চন্দন এবং দিব্যমালা প্রভৃতি দেওয়ার রীতি ছিল। সমাজে বিভিন্ন লোকাচার, যেমন নান্দীমুখ, গঙ্গাপূজা, ষষ্ঠীপূজা, স্ত্রীবরণ, তৈলস্নান ইত্যাদির প্রচলন ছিল। সেকালে গুরুকে শ্রদ্ধা জানানোর অন্যতম রীতি ছিল গুরুদক্ষিণা প্রদান। গ্রামজীবনের সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক দিনলিপি থেকে তাদের দুঃখ-দারিদ্র্য, চাষ-বাস, সাজ-সজ্জা, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিচয় পাওয়া যায়।

সেকালে সমাজে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্মীয় গোঁড়ামি বা অন্ধত্ব ছিল। এর ফলে নিজ নিজ ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করার মানসিকতা বর্তমান ছিল।

'চৈতন্যভাগরত'-এ তৎকালীন রাঢবঙ্গের যে আর্থ-সামাজিক চালচিত্রের ছবি ফুটে উঠেছে, তা প্রকৃত অর্থে পঞ্চদশ থেকে যোড়শ- এই সুদীর্ঘ দুটি শতাব্দীর ইতিহাস - যা বৃন্দাবন দাস বস্তুনিষ্ঠ, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি শূন্য ও ইতিহাস-সম্মতভাবে বর্ণনা করেছেন।

১১.৫। ষোড়শ শতকের তৎকালীন রাঢ়বঙ্গের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট

'চৈতন্যভাগবত'কে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির আকর গ্রন্থ বললে অত্যুক্তি হয় না। বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষের নানা কর্মচাঞ্চল্যে, বিদ্যাচর্চার গৌরবে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের তর্জন-গর্জনে প্রাণবন্ত নবদ্বীপের যে ঐতিহাসিক জীবন্ত চিত্র এ গ্রন্থে ফুটে উঠেছে, অন্য কোনো জীবনীগ্রন্থে তার তেমন পরিচয় মেলে না।

নবদ্বীপে একদিকে বিদ্যা ও পান্ডিত্যের মল্লক্রীড়া, অন্যদিকে নিরর্থক আড়ম্বরপূর্ণ ধর্ম-কর্ম। বৃন্দাবন দাসের লেখনীতে-

'মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।

দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।।'

আবার

'মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে'

অর্থাৎ 'সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে'। পাশাপাশি গুটিকয় সদাচারী নিষ্ঠাবান ভক্তিপন্থী বৈষ্ণব, যাঁদের 'আলাপের স্থান নাহি করেন ক্রন্দন'- তাঁদেরকে কেন্দ্র করে শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে এক অভূতপূর্বঅনন্যসাধারণ ভক্তি আন্দোলন।

শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালে গৌড়ের অধিপতি হুসেন শাহ, যিনি যথেষ্ট উদার প্রকৃতির ও সংস্কৃতিমনস্ক। রাঢ়বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ভারপ্রাপ্ত মুসলমান শাসকদের শাসকদের দোর্দন্ড প্রতাপ, হিন্দুবিদ্বেষ, জবরদস্তি ধর্মান্তরকরণ, সংকীর্তন-বিরোধিতা থাকলেও হুসেন শাহ ব্যক্তিগতভাবে আপন দূরদর্শিতা ও বাস্তব উপলব্ধি বলে পরধর্মসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সুস্থিতি রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছিলেন।

বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা অনুসারে, সেকালের নবদ্বীপ ছিল এক সমৃদ্ধশালী গ্রাম। নানা জাতির অসংখ্য মানুষেরা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও অখণ্ড বৈষয়িক সুখে দিনাতিপাত করত। কিন্তু এরা মূলত ছিল আত্ম-অহংকারী ও ঐহিক সুখভোগ-পরায়ণ, দয়া, দান বা ভক্তির

ক্ষেত্রে এরা যথার্থই ছিল দীন। কলির প্রভাবে এরা যেন সব ভগবদভজনহীন এবং শিশ্নোদর-পরায়ণ। 'প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার'। নবদ্বীপ তখন প্রধান বামাচারী তান্ত্রিকগণের লীলাস্থল। লোকে মনসা-বাশুলীর পূজা করত, মদ্য-মাংস দিয়ে যক্ষপূজা করত, রাত জেগে মঙ্গলচন্ডীর গান শুনত।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সময় রাঢ়বঙ্গদেশে সুফি ও দরবেশ নামে এক ধরনের মুসলমান সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। এঁদের যথেষ্ট সামাজিক সম্মান ছিল এবং এঁরা রাজনীতিতে যথেষ্ট গুরুত্ব পেতেন। মূলত এঁদের প্রভাবেই তখন হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বহু মানুষ মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে সনাতন হিন্দু ধর্মের উদারতা, ত্যাগ-সহিষ্ণুতা ও প্রেম ভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যে গৌরব ও মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, তাতে করে একদিকে যেমন ধর্মান্তর বোধ হয়, অন্যদিকে এক জাতপাতহীন ভেদবুদ্ধি হীন উদার আদর্শ বহুল মহান মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়।

পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীতে এদেশে কীভাবে নাট্যাভিনয় হত তার পরিচয় কেবল চৈতন্যভাগবতেই পাওয়া যায়। একবার শ্রীচৈতন্যদেব ব্রজলীলার মাথুর বিরহের সঙ্গে রুক্মিণীর অনুরাগ মেশানো একটা পালার অভিনয় করেছিলেন। তা ছাড়া নিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যকালে অভিনয় পটুতা ও লৌকিক অভিনয়ের আনুপুঙ্খ বর্ণনা রীতির পরিচয়ে তৎকালীন সাংস্কৃতিক চালচিত্রের হদিশ পাওয়া যায়।

তৎকালে রাঢ়বঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবী, যেমন- মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, বাশুলী, যক্ষ পূজার প্রচলন ছিল। অসংখ্য লোক গঙ্গাস্নানে যেতেন, কিন্তু সমাজে শিষ্টাচারের কোনো বালাই ছিল না। এমনকি কোনো সূক্ষ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও ছিল না। হিন্দু সমাজের অধিকাংশ লোক ছিলেন পঞ্চোপাসক, স্মার্ত। অন্ধ সংস্কার, লোকবিশ্বাস তখন সমাজে বহু প্রচলিত ছিল। তখনকার সমাজের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবক্ষয় অধোগতির এক চূড়ান্ত রূপের পরিচয় পাওয়া যায় 'চৈতন্যভাগবত'-এ।

১১.৬। অনুশীলনী

১। কোনো গ্রন্থপাঠের জন্য স্থানকাল প্রেক্ষিত জরুরি কেন ?

২। বৃন্দীবন দাসের কাল ও তৎকালীন রাঢবঙ্গের রাজনৈতিক চালচিত্রের পরিচয় দিন'।

৩। যোড়শ শতাব্দীর রাটুবঙ্গের আর্থসামাজিক চালচিত্রের পরিচয় দিন ।

৪। ষোড়শ শতকের রাঢবঙ্গের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় চালচিত্রের পরিচয় দিন ।

৫। চৈতন্যভাগবত ব্যতীত অন্যান্য বৈষঞব জীবনীকাব্যগুলির পরিচয় দিন।

৬। চৈতন্যজীবনীকার বৃন্দাবন দাসের সমকালীন বৈষঞব সমাজের পরিচয় দিন।

৭। চৈতন্যজীবনীকার বৃন্দাবন দাসের সমকালীন রাটবঙ্গের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক চালচিত্রের পরিচয় দিন।

৮। যোড়শ শতকের রাঢবঙ্গের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় চালচিত্রের পরিচয় দিন।

৯। বৃন্দাবন দাসের সমকালীন বৈষ্ব সমাজ ও অন্যান্য বৈষ্ণব জীবনীকাব্যগুলির পরিচয় দিন।

১১.৭। গ্রন্থপঞ্জি

১. শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত - ড. রাধাগোবিন্দনাথ সম্পাদিত

২. শ্রীচৈত্যভাগবত - ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত

৩. শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত - অধ্যাপক দুর্গাপদ গাঙ্গুলী সম্পাদিত

৪. শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত - প্রণয়কৃষ্ণ বসু সম্পাদিত

৫. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম) - ড. সুকুমার সেন

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য়) - ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম) - ড. ভূদেব চৌধুরী

৮. বাংলার সাহিত্য লোক (১ম) - ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা

৯. শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান - ড. বিমানবিহারী মজুমদার

মন্তব্য

১০. বৈষ্ণব চরিত সাহিত্য - ড. গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী

একক: ১২ : কবি ও তাঁর কাব্যের পরিচয়

বিন্যাসক্রম

১২.১। উদ্দেশ্য

১২.২। কবি বৃন্দাবন দাসের পরিচয়

১২.৩। চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের উৎস নির্ণয়

১২.৪। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থটি রচনা কারণ

১২.৫। চৈতন্যভাগবত: পুঁথি ও মুদ্রণ প্রসঙ্গ

১২.৬। চৈতন্যভাগবত: পাঠান্তর প্রসঙ্গ

১২.৭। কবি বৃন্দাবন দাস সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত

১২.৮। অনুশীলনী

১২.৯। গ্রন্থপঞ্জি

১২.১। উদ্দেশ্য

মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য জীবনীগ্রন্থ। বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক তথ্যের নিরিখে বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ না হলেও প্রথম জীবনী গ্রন্থ বলে পরিগণিত হবার মুল্য ও মর্যাদার অধিকারী। এর আগে মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ এবং বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের ‘মনসা বিজয়’ ও কৃত্তিবাসের ‘রামায়ণ’ বা ‘শ্রীরামপাঁচালী’ বিরচিত হয়ে থাকলেও ওই গ্রন্থগুলির সমসাময়িক প্রাচীন রূপ রক্ষিত হয়নি। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থটির এইখানেই সার্থকতা ।

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সার্থকভাবে চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ লিখেছিলেন বৃন্দাবন দাস। বৃন্দাবন দাস অনুমানিক ১৫১৮-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম নারায়ণী, পিতা কুমারহট্টের বিপ্র বৈকুণ্ঠনাথ। গয়া থেকে ফিরে শ্রীচৈতন্য নারায়ণীকে তাঁর অধরামৃত প্রসাদ দিয়েছিলেন। এই জন্যই নারায়ণী 'চৈতন্যের অবশেষ পাত্র'। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ প্রভুর সর্বশেষ ভৃত্য অর্থাৎ শিষ্য, এবং তাঁরই আদেশে তিনি 'চৈতন্যভাগবত' রচনায় প্রবৃত্ত হন।

'চৈতন্যভাগবত'-এর রচনাকাল আনুমানিক ১৫৪৬ থেকে ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। 'চৈতন্যভাগবত', গ্রন্থটি আকারে বেশ বড়ো। তিন খণ্ডে বিন্যস্ত- আদি, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ড। তিন খণ্ড মিলিয়ে মোট পয়ার ত্রিপদীর সংখ্যা বারো হাজার দুশো তেষট্টি এবং সংস্কৃত শ্লোক সংখ্যা একশো কুড়িটি। গ্রন্থটি পাঠ এবং সংগীত উভয় উদ্দেশ্যেই লেখা। গানগুলিতে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতন্যের জীবনকে আদি, মধ্য ও অন্ত্য ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকটিকে 'খণ্ড' এবং খণ্ডের পরিচ্ছেদকে 'অধ্যায়' নাম দেওয়া হয়েছে। আদি খণ্ডে বারো অধ্যায়- শ্রীচৈতন্যের জন্ম থেকে গয়া গমন পর্যন্ত এই খণ্ডের বিষয়বস্তু। মধ্য খণ্ডে ছাব্বিশ অধ্যায়- গয়া থেকে ফিরে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত নবদ্বীপ লীলা এই খণ্ডের বিষয়বস্তু এবং অন্ত্য খণ্ডে এগারো অধ্যায়- সন্ন্যাসের পর পুরী গমন, গৌড়ে আগমন এবং পুরীতে প্রত্যাবর্তনের পর গৌড়ীয় ভক্তদের পুরীতে আগমনেই এই খণ্ডের সমাপ্তি।

সুতরাং, বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক চৈতন্যজীবনী গ্রন্থের রচয়িতা বৃন্দাবন দাস এবং তাঁর রচিত 'চৈতন্যভাগবত' সম্পর্কে সাধারণ সম্যক জ্ঞানের পরিচয় দানই এই একক-এর উদ্দেশ্য। বৃন্দাবন দাস কেবল কবি নন, ভক্ত কবি, কেবল শাস্ত্রজ্ঞ নন, ভাগবত-রসপিপাসু; শ্রীচৈতন্য তাঁর কাছে কেবল মহামানব নন। স্বয়ং ঈশ্বর, নরনারায়ণরূপী সেই ঈশ্বরকে কীভাবে তাঁর কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন- সেটা জানানোই এই একক-এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

১২.২। কবি বৃন্দাবন দাসের পরিচয়

বৃন্দাবন দাসের জন্ম বৃত্তান্ত বা বংশ পরিচয় সম্পর্কে বিস্তৃত কোনো তথ্য জানা যায় না। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী তিনি তাঁর গ্রন্থেও বংশপরিচয় দেননি। তবে তাঁর জন্মসূত্রের কিছুটা আভাস তিনি দিয়েছেন-

'সর্বশেষ ভূত্য তান বৃন্দাবন দাস।

অবশেষ পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত।।'

এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, বৃন্দাবন দাস ছিলেন প্রভু নিত্যানন্দের সর্বশেষ শিষ্য (ভৃত্য) এবং শ্রীচৈতন্যদেবের 'অবশেষ পাত্র' বা উচ্ছিষ্টভাজন নারায়ণীর পুত্র। তাঁর পিতার পরিচয় স্পষ্ট করে না জানলেও তিনি যে শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর সন্তান- এই তথ্য স্পষ্ট।

নারায়ণী ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্যা। পিতৃবিয়োগের পর শ্রীগৌরাঙ্গ গয়াধাম থেকে ফিরে চার বছরের কন্যা এই নারায়ণীকে 'চর্বিত তাম্বুল' এবং 'গলার মালা' দিয়ে কৃপা করেছিলেন। এইজন্য বৃন্দাবন দাস জন্মদাত্রী নারায়ণীকে চৈতন্যের 'অবশেষপাত্র' তথা 'উচ্ছিষ্ট ভাজন' রূপে উল্লেখ করেছেন। মূলত নারায়ণীকে উপলক্ষ্য করেই যেন শ্রীবাসের গৃহে মহাপ্রভু আত্মপ্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য- বৈষ্ণব সমাজে মহাজনের উচ্ছিষ্টকে বলা হয় 'মহাপ্রসাদ'- এতে ভগবানের 'অধরামৃত' মেশান থাকে, ফলে এই 'মহাপ্রসাদ' গ্রহণ করলে 'কৃষ্ণভক্তি' হয়। নারায়ণীকে শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণভক্তিপাত্র রূপে এভাবেই তৈরি করেছিলেন। কারণ তিনি তো সর্বজ্ঞ ভগবান, মা যদি কৃষ্ণ ভক্তিসিক্ত না হন, তাহলে পুত্র কীভাবে কৃষ্ণভক্ত হবে, তাই বৃন্দাবন দাসের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপটকে প্রভু এভাবেই নির্মাণ করলেন।

'প্রেমবিলাস' নামক গ্রন্থে বৃন্দাবনের পিতৃ পরিচয়ের উল্লেখ আছে। ত্রয়োবিংশ বিলাসে উল্লেখ আছে-

'কুমারহট্টে বিপ্র বৈকুণ্ঠনাথ যিঁহো।

তাঁর সহিত নারায়ণীর হৈল বিবাহ॥

তাঁর গর্ভে জনমিলা বৃন্দাবন দাস।'

আরও উল্লেখ আছে-

'বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্ভে।

তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠনাথ চলি গেল স্বর্গে।।'

অর্থাৎ বৃন্দাবন যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়।

বিভিন্ন কবির উল্লেখিত নারায়ণী সম্পর্কে 'শৈশবে বিধবা ধনি' কিংবা 'অভর্তৃকা' শব্দগুলির জন্য অনেকে বৃন্দাবনের জন্মবৃতান্ত নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে প্রাজ্ঞ গবেষকদের মতানুযায়ী বলা চলে- 'শৈশব' বলতে চার বছর নয়- চৌদ্দ বছরকেও ধরা যায় সেই বয়সে যদি নারায়ণীর গর্ভসঞ্চার হয় এবং বৈধব্য ঘটে তাহলে বৃন্দাবনের জন্ম-রহস্যের জট খোলে।

তাই সকল তথ্য অনুসন্ধান করে বলা যায় বৃন্দাবনের আবির্ভাবকাল ১৫১৮-১৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই সময় মহাপ্রভু পুরীধামে। মহাপ্রভুর লীলাসুখ দর্শন থেকে বঞ্চিত বলে বৃন্দাবন নিজেকে বলেছেন-

'হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে।

হইলাঙ বঞ্চিত সে সুখ দরশনে।।'

১২.৩। চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের উৎস নির্ণয়

ভক্ত কবি বৃন্দাবন দাসের মানসলোকেই নিহিত ছিল 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের বীজ। গ্রন্থের একাধিক স্থানে তাঁর এই মানস-আকাঙক্ষার ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে-

'অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।

চৈতন্যচরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে ।।'

বৃন্দাবন দাসের দীক্ষাগুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশেই তিনি এই গ্রন্থ লেখায় প্রবৃত্ত হন।

গ্রন্থটির উৎস নির্দেশ বা উপাদানের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে বৃন্দাবন দাসের কিছু কিছু স্বীকারোক্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে-

(ক) উপাদান সংগ্রহে নিত্যানন্দ সূত্র: চৈতন্যভাগবত-এর মধ্য খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে নিত্যানন্দ প্রভুকে মহাপ্রভু ষড়ভুজ মূর্তি দেখিয়েছিলেন-

'আপনে কহিয়া আছেন ষড়ভুজ দর্শনে।

তান প্রীতে কহি তান এসব কথনে।।'

এ সংবাদ বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ প্রভুর কাছেই পেয়েছিলেন। এ ছাড়া শ্রীচৈতন্যের কাজি উদ্ধার, বৈষ্ণব তত্ব ও মহিমা বিষয়ক সংবাদও তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।

(খ) উপাদান সংগ্রহে অদ্বৈত সূত্র: শ্রী অদ্বৈতের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণের মতো শ্রীচৈতন্যও তাঁকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন। যেমন-

'অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।

ইহা যে না মানয়ে সে দুষ্কৃতি সর্বথা ।

(মধ্য খণ্ড, চতুর্বিংশ অধ্যায়)

(গ) উপাদান সংগ্রহে গদাধর সূত্র : শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ গদাধর পণ্ডিতের শ্রীমুখ থেকেও বৃন্দাবন দাস কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন- 'গদাধর-শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি'- এই শ্লোকে তার প্রমাণ মেলে। অন্ত্য খণ্ডে জগন্নাথের ওড়ন যষ্ঠীযাত্রা এবং পুন্ডরীক বিদ্যানিধির প্রসঙ্গ গদাধর পণ্ডিতের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ।

(ঘ) মুরারি গুপ্তের সূত্র : মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলার প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর রচিত 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত' নামক সংস্কৃত গ্রন্থটির কাছে বৃন্দাবন দাস অনেকটাই ঋণী। 'চৈতন্যভাগবত'এর প্রারম্ভিক শ্লোকের

চারটির মধ্যে শেষের দুটি শ্লোক, অন্ত্য খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে রামাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকের উদ্ধৃতি মুরারি গুপ্ত থেকেই গৃহীত।

(ঙ) শ্রীচৈতন্যভক্ত ও কিংবদন্তী সূত্র : শ্রীচৈতন্যদেবের লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত যেমন ছিলেন, তেমনই আবার অনেক পরোক্ষ ভক্তও ছিলেন। উভয় প্রকার ভক্তস্থান থেকেই লৌকিক-অলৌকিক নানা তথ্য বৃন্দাবন দাস গ্রহণ করেছিলেন।

সুতরাং বলা যায়, 'চৈতন্যভাগবত' রচনার উৎস-সূত্রগুলির প্রত্যক্ষতা-পরোক্ষতা সবকিছু যথাসম্ভব বিচার করে গ্রহণ করে ভক্ত কবি তত্ব ও তথ্যনিষ্ঠ রূপদানের দ্বারা গ্রন্থটিকে সার্থক প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থরূপে সৃষ্টি করেছেন।

১২.৪। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থটি রচনা কারণ

মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য জীবনীগ্রন্থ বা চরিত-সাহিত্য। জীবনীগ্রন্থে ব্যক্তি বিশেষের জীবন ধারা বর্ণনাই মুখ্য। বাঙালি জাতি তথা বাংলা ভাষার সৌভাগ্য পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। সমগ্র বাঙালি জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় রূপরেখার সুদৃঢ় ভিত্তি তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি নিজে কিছু না লিখেও এক সুশিক্ষিত অনুগামী পন্ডিত ভক্তকুল সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ, ভজনশীল, ব্রজনিষ্ঠ। মূলত সংস্কৃত ভাষায় এঁরাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নেতৃতে গঠন করলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়। কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য বাংলা ভাষায় প্রয়োজন ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা অবতার পুরুষ স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন ও কর্ম বিবরণ রচনা। বৃন্দাবন দাস প্রথম সার্থকভাবে সেই কাজটি সম্পন্ন করলেন।

'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থরচনার বহুবিধ কারণের মধ্যে বলা যায়-

(ক) বৃন্দাবন দাসের অকপট স্বীকারোক্তি-

'অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে॥'

শ্রীগুরু নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশেই তিনি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন।

(খ) বৃন্দাবন দাসের মাতা নারায়ণী যিনি শৈশবেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আশীর্বাদ-কৃপা প্রাপ্ত। আবার নারায়ণী শ্রীগৌরাঙ্গের অন্যতম পার্ষদ ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ফলে বৃন্দাবন দাস আজন্ম বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণব পরিমণ্ডলেই লালিত পালিত।

(গ) বৃন্দাবন দাস পরম ভাগবত, নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, অসাধারণ কবিত্ব শক্তির অধিকারী। ফলে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থ রচনায় তাঁর আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।

(ঘ) বৃন্দাবন দাস সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ। একদিকে 'শ্রীমদ্ভগবত', অন্যদিকে ষড়গোস্বামীর সৃষ্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব-দর্শন। এ ছাড়া পূর্বসূরি অন্যান্য অগ্রজ বৈষ্ণব ভক্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্রীচৈতন্য জীবনীগ্রন্থ। কিন্তু বাংলা ভাষায় কোনো জীবনীগ্রন্থ না থাকায় আপামর সাধারণ বাঙালির সংস্কৃতে বুৎপত্তি না থাকা হেতু শ্রীচৈতন্য চরিতসুধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার যন্ত্রণা বৃন্দাবন দাসকে ব্যথিত করেছিল।

(ঙ) শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলা এবং ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য রসিক জনের হৃদয় হরণ করেছে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে পদাবলী সাহিত্যে জোয়ার এলেও পরম্পরাগত ভাবে বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্য-জীবনীর অভাব ছিল। দীর্ঘ মানসিক প্রস্তুতি, শ্রীগুরু-নির্দেশে এবং ভজনশীল স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তির বাসনাই 'চৈতন্যভাগবত' রচনার অন্যতম কারণ ।

(চ) বৃন্দাবন দাস ভক্ত কবি হওয়া সত্বেও শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবন বর্ণনার পাশাপাশি তৎকালীন বঙ্গের যে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় চালচিত্র ছিল তার বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র অঙ্কনের জন্য সমাজ অভিজ্ঞ, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী তিনি পৃথক কোনো গ্রন্থ রচনা না করে 'চৈতন্যভাগবত'-এ-ই তা স্পষ্ট করেছেন। যদি তিনি আধুনিককালে জন্মগ্রহণ করতেন তবে নির্ঘাত গদ্য বাংলা ভাষায় তাঁর এই অমিত শক্তির পরিচয় দিতেন।

১২.৫। চৈতন্যভাগবত: পুঁথি ও মুদ্রণ প্রসঙ্গ

'চৈতন্যভাগবত' বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক জীবনীগ্রন্থের মর্যাদা পেলেও গ্রন্থটির নামকরণ নিয়ে মতভেদ ও বিতর্ক আছে। গ্রন্থটির নাম আদতে 'চৈতন্যমঙ্গল' না 'চৈতন্যভাগবত', ছিল তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা মতভেদ ও বিতর্ক আছে। এই বিতর্ক সোচ্চার হয় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের কিছু মন্তব্যকে ভিত্তি করে। আধুনিক সমালোচক ড. বিমানবিহারী মজুমদারের দেওয়া তথ্যকে কেন্দ্র করে সে বিতর্ক নতুন মোড় নেয়।

'প্রেমবিলাস'-এর উনিশ বিলাসে বলা হয়েছে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থনাম ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল', অন্যদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজও একাধিক স্থানে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ প্রসঙ্গে 'চৈতন্যমঙ্গল' নামটির উল্লেখ করেছেন। আধুনিক কালের গবেষক ড. বিমানবিহারী মজুমদারের 'শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান' গ্রন্থে বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশে জানিয়েছেন গ্রন্থটির নাম 'চৈতন্যমঙ্গল'-ই ছিল। কিন্তু অনেক সমালোচক বিমানবিহারীবাবুর এই যুক্তি মানতে নারাজ। তাঁদের যুক্তি, বৃন্দাবন দাস যদি 'চৈতন্যভাগবত' নাম পরিবর্তন করে 'চৈতন্যমঙ্গল' নাম রাখতেন এবং সে সংবাদ সুদূর বৃন্দাবনসহ সর্বত্র ছড়িয়ে দিতেন, তবে সেই পরিবর্তিত নাম যুক্ত কোনো কোনো পুঁথির সন্ধান মিলত। কিন্তু আজ পর্যন্ত বৃন্দাবন দাস লিখিত 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে কোনো পুঁথির সন্ধান মেলেনি।

শেষ জীবনে বৃন্দাবন দাস বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে থাকতেন। এই গ্রামের অধিবাসী অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী বৃন্দাবন দাসের পাটবাড়ি থেকে 'চৈতন্যভাগবত'-এর নতুন তিনটি অধ্যায়ের পুঁথি পেয়ে ৪২৪ চৈতন্যাব্দে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছিলেন।

'চৈতন্যভাগবত'-এর একাধিক ভালো সংস্করণ আছে। সম্ভবত 'চৈতন্যভাগবত', প্রথম ছাপা হয়েছিল ১২৪৫ বঙ্গাব্দে শোভাবাজারে তারাপদ তর্কবাগীশের পদ্মালয় যন্ত্রে। এছাড়া দুই প্রকাশকের সহযোগিতায় গদ্যের মতো টানা রয়াল সাইজের সংস্করণটি দুটি প্রেস থেকে তিন খণ্ডে ছাপা হয়েছিল। আদি খণ্ড চুরানব্বই পৃষ্টা, মধ্য খণ্ড একশো তিপ্পান্ন পৃষ্ঠা এবং অন্ত্য খণ্ডে একশো পাঁচ পৃষ্ঠা। মুদ্রণকাল যথাক্রমে '২০ ফাল্গুন', '৭ চৈত্র' এবং '২০ চৈত্র' ১২৪৯ বঙ্গাব্দ (অর্থাৎ ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ মার্চ-এপ্রিল)। ছাপা হয়েছিল দুটি প্রেসে-

রাধাগোবিন্দ শীল, রামগোবিন্দ শীল এবং মধুসূদন শীলের জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে (১৫০ নং আহিরীটোলা) আদি ও শেষ খণ্ড। আর ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য ও কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সারসংগ্রহ যন্ত্রে শোভাবাজার বটতলার দক্ষিণাংশে মধ্য খণ্ড। আদি ও অন্ত্য খণ্ড সম্পাদনা করেছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীল ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কিন্তু মধ্য খণ্ডে সম্পাদনার কোনো উল্লেখ নেই। আদি খণ্ডে পৃষ্ঠায় লেখকের ও গ্রন্থের নাম যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে সেটি হল-

‘দেবরাজ কমলাসন শঙ্কর নারদ শুক সনকাদি /

কর্তৃক নিরন্তর নিসেব্যবান / শ্রীমচ্চরণ কমল

যুগলস্য তমো মোহ মহামোহ তামিস্রান্ধতামিস্র /

রূপ পঞ্চ ক্লেশ সন্তত সকল ভুবনোদ্ধারণ পরম

করুণা পারাবারস্য / সমাতিশয় রহিত রসাবেশ নব

জাম্বুনদরাজি / বিজয়ী নিজ কান্তি পীযূষ ধারা

সার সন্তর্পিত সকল ভক্তজন / নয়ন চকরস্য /

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য পরমমধুর চরিত্রাবলী বলিত /

বৃন্দাবন দাস কর্তৃক গ্রন্থিত / শ্রীচেতন্য ভাগবত

নামকো গ্রন্থঃ আদি খণ্ডঃ ।

(সুকুমার সেন সম্পাদিত ‘চৈতন্যভাগবত’)

‘চৈতন্যভাগবত’ বৈষ্ণবদের কাছে ‘শ্রীমদভাগবত’-এর মতোই মান্য হয়েছিল। বাংলা কোনো পুঁথিরই ‘চৈতন্যভাগবত’-এর মতো এত বেশি অনুলিপি হয় নি।

১২.৬। চৈতন্যভাগবত: পাঠান্তর প্রসঙ্গ

ড. সুকুমার সেন 'চৈতন্যভাগবত'-এর সম্পাদক হিসাবে ভূমিকা অংশে জানিয়েছেন- "যতদূর মনে হয় চৈতন্যভাগবত প্রথম ছাপা হয়েছিল ১২৪৫ সালে শোভাবাজার তারাপদ তর্কবাগীশের পদ্মালয় যন্ত্রে।"

ড. সেনের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনানুযায়ী বলা যায়- 'চৈতন্যভাগবত'-এর পুঁথিতে পাঠান্তর অল্পই আছে এবং সাধারণত তা উল্লেখযোগ্য নয়, বেশির ভাগ পাঠান্তর হল প্রাচীন পদ এবং বাক্যাংশকে ঢেলে সাজা। ব্যাখ্যার ধরনে কিছু কিছু সংযোগ লক্ষ করা যায়।

'চৈতন্যভাগবত'এর একাধিক ভালো সংস্করণ আছে। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠটি দুই প্রকাশকের সহযোগিতায় দুটি প্রেসে ছাপা তিন খণ্ডের রয়াল সাইজ সংস্করণ। গদ্যের মতো টানা ছাপা।

'চৈতন্যভাগবত' তিন খণ্ডে বিভক্ত- আদি, মধ্য ও শেষ বা অন্ত্য। এই পরিকল্পনা বৃন্দাবন দাস প্রথম থেকেই করেছিলেন। তিন খণ্ডের বিষয়সূচি আদি খণ্ডের প্রথম অধ্যায়েই দিয়েছেন। আদি খণ্ডের মতো মধ্য ও শেষ খণ্ডেও বিষয়সূচি দেওয়া আছে । কিন্তু সে সূচির শেষ কটি ব্যাপার অবর্ণিত রয়ে গিয়েছে। ড. সুকুমার সেন যে গ্রন্থটি পেয়েছেন সেটি ছাপা ১২৪৯ বঙ্গাব্দে। প্রথম ছাপা গ্রন্থটি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি, সুতরাং ব্যবহারও করতে পারেননি। তবে তাঁর প্রাপ্ত এবং ব্যবহৃত সংস্করণটির পাঠ ভালো এবং পুরোনো পুঁথি থেকে নেওয়া। এতে সমকালীন ভাষার সমীচীনতা যথা সম্ভব বজায় আছে।

ড. সেনের প্রাপ্ত গ্রন্থের সঙ্গে 'চৈতন্যভাগবত'এর মধ্য ও শেষ খণ্ডের বিষয় সূচির মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। প্রাপ্ত গ্রন্থে রূপসনাতনের সঙ্গে মিলনের পরে পুন্ডরীক বিদ্যানিধির কথায় সমাপ্তি ঘটেছে। অথচ বিষয়সূচিতে রয়েছে-

'শেষ খণ্ডে গৌরচন্দ্র গেলা বারাণসী

না পাইল দেখা যত নিন্দুক সন্ন্যাসী।

শেষ খণ্ডে পুন নীলাচলে আগমন

অহর্নিশি করিলেন হরিসংকীর্তন।

শেষ খণ্ডে নিত্যানন্দ কতেক দিবস

করিলেন পৃথিবীর পর্যটন রস।

অনন্ত চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে

চরণে নূপুর সর্ব মথুরা বিহরে।'

বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থ মধ্যে কোথাও অধ্যায়ের উল্লেখ করেছিলেন বলে মনে হয় না। বিষয়বস্তুতে কোনো হেরফের না থাকলেও বিভিন্ন পুঁথিতে প্রত্যেক খণ্ডে অল্প-বিস্তর অধ্যায়ে সংখ্যার গরমিল দেখা যায়। তবে 'অধ্যায়' নাম না দিলেও বৃন্দাবন দাস যেভাবে ভণিতা দিয়ে বর্ণনার জের টেনে গিয়েছেন তাতেই অধ্যায়ের কাজ মিটেছে। যেসব পুঁথিতে এইভাবে অধ্যায় নির্দিষ্ট হয়েছে সেই সব পুঁথিই এই বিষয়ে খাঁটি । ড. সেনের পরিগৃহীত গ্রন্থে আদিখণ্ড পনেরো, মধ্য খণ্ড ছাবিবশ, এবং শেষ খণ্ড নয়- মোট পঞ্চাশ অধ্যায়।

১২.৭। কবি বৃন্দাবন দাস সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত

বৃন্দাবন দাস সম্পর্কে সর্বাগ্রে সশ্রদ্ধ মর্যাদা ও সম্মান জ্ঞাপন করেন 'চৈতন্যচরিতামৃত'এর স্রষ্টা কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ। গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন- 'চৈতন্যচরিতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস'। বৃন্দাবন দাস নিজেও গ্রন্থ মধ্যে একাধিক বার নিজেকে 'ব্যাস' বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যাসদেব যেমন সংস্কৃত ভাষায় 'ভাগবত' রচনা করে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাদির দ্বারা তাঁর ভগবত্তা প্রতিষ্ঠা করে আপামর ভক্তমণ্ডলীকে ভক্তিস্নাত করেছেন, তেমনই বাংলা ভাষায় বৃন্দাবন দাসও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি এই কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে আবির্ভূত হলেন, তাঁর বিচিত্র লীলাদি প্রকাশ করে আপামর বাঙালি ভক্তমণ্ডলীর রসপিপাসা নিবারণ করলেন। সুতরাং

স্বাভাবিকভাবেই বৃন্দাবন দাস ব্যাসদেবের সঙ্গে তুল্য হয়েছেন বলে মনে হয়। তাঁর ‘চৈতন্যভাগবত’ সম্পর্কে কৃষ্ণদাসের মন্তব্য-

‘মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।

বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।।’

বৃন্দাবন দাসের সমবালীন কবি লোচন দাস। তাঁর জীবনী গ্রন্থের নাম ‘শ্রীচৈতন্যমঙ্গল’। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের ‘শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান’ গ্রন্থে ‘শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব’ গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি মেলে। তা থেকে জানা যায়, ঠাকুর নরহরি সরকারের আদেশে লোচন দাস যে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, সেখানে অগ্রজ কবি বৃন্দাবন দাস সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-

‘শ্রীবৃন্দাবন দাস বন্দিব এক চিতে।

জগৎ মোহিত যার ভাগবত গীতে।।’

সমকালীন কবি জয়ানন্দও তাঁর ‘চৈতন্যমঙ্গল’ গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থের নামোল্লেখ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

বৃন্দাবন দাস শেষ জীবনে যে গ্রামে থাকতেন সেই গ্রাম শ্রীপাট দেনুড়ের অধিবাসী অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ‘চৈতন্যভাগবত’এর নতুন তিনটি অধ্যায়ের পুঁথি পেয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন। পুস্তিকাটির শেষে তিনি গ্রন্থকারের জীবনী দিয়েছেন। তাতে তিনি বৃন্দাবন দাস সম্পর্কে জানিয়েছেন- “..... তাহার দেনুড় গ্রামে বসতির হেতু এই রূপ - একদা নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য বৃন্দাবন দাস যাত্রা করেন। নিত্যানন্দ প্রভু দেনুড়ে আসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করেন। ভোজনান্তে বৃন্দাবনকে মুখশুদ্ধির জন্য জিজ্ঞাসিলে, তিনি বলেন কল্যকার হরীতকী আছে গ্রহণ করুন। এই সঞ্চয়ের কথায় নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে নীলাচল ভ্রমণে বাধা দেন এবং ঐ গ্রামেই সেবা প্রকাশ করিতে আদেশ করেন। সেই হইতেই দেনুড়ের পাটবাড়িটি আজ চারিশত বৎসর অপ্রতিহত আছে। যে স্থানে ঠাকুর বৃন্দাবনের সমাধি প্রাপ্তি, তাহা যে অতি পবিত্র তীর্থ তাহা বলাই বাহুল্য।”

অতুলকৃষ্ণ গোস্থামী তাঁর ‘শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস’ শীর্ষক প্রবন্ধে জানিয়েছেন - “পরম পরিতাপের বিষয়, তাঁহার সেই আদি কবির সেই বঙ্গীয় সাহিত্য কাননের কলকণ্ঠ কোকিল ব্যাসাবতার বৃন্দাবন দাসের পবিত্র জীবনের সকল কথা জানিবার কোন উপায় নাই। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে এই টুকুই অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণী দেবীর গর্ভে তাহার জন্ম এবং প্রভু নিত্যানন্দের প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া থাকাই তাঁর কর্ম।

বৃন্দাবন দাস তাঁর ‘চৈতন্যভাগবত’এ ব্যক্তি জীবনের উপর আলোকপাত করেছেন বেশি, চৈতন্যের ভাবজীবনকে দার্শনিকতার আলোকে তেমন দেখেননি। কোনো কোনো সমালোচক তাই সমস্ত বিষয় বিচার করে গ্রন্থখানির ত্রুটির কথাও উল্লেখ করেছেন। তবে প্রখ্যাত বৈষ্ণবগ্রন্থ-গবেষক ড. বিমানবিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছেন- “ঐতিহাসিকের বহির্মুখী দৃষ্টির নিকট খুঁটিনাটি ঘটনায় বৃন্দাবন দাসের সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়িলেও ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ধর্ম সমাজ ও সৃতি বিনে প্রীচৈতন্যভাগবত এঁতিহাসিক তথ্যের আকর স্বরূপ।”

ড. সুকুমার সেন বৃন্দাবন দাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন - “বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থই বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম দীর্ঘ রচনা যাহাতে দেবদেবী নহে, গালগল্প নহে, এক সমসাময়িক সুপরিজ্ঞাত মানুষের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তখনকার দিনে আধুনিক জীবনকাহিনী প্রত্যাশিত নয়।.....”

বৃন্দাবন দাসের পর যাঁরা চৈতন্য জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। মূলত তাঁর গ্রন্থই চৈতন্য জীবনের আকর গ্রন্থ। তিনি তাঁর অগ্রজ কবি বৃন্দাবন দাসকে গভীর শ্রদ্ধায় ভক্তিবিনম্র চিত্তে স্মরণ করে লিখেছেন-

‘বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।

তার আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ ।।

চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।

তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥'

১২.৮। অনুশীলনী

১। কবি বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।

২। বৃন্দাবন দাসের জীবনী আলোচনা করুন।

৩। 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থ রচনার কারণ আলোচনা করুন।

৪। 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটির পাঠান্তর প্রসঙ্গ আলোচনা করুন।

৫। 'চৈতন্যভাগবত'এর পুঁথি প্রসঙ্গ এবং মুদ্রিত গ্রন্থ প্রসঙ্গ আলোচনা করুন।

৬। 'চৈতন্যভাগবত' ব্যতীত বৃন্দাবন দাসের অন্যান্য গ্রন্থ রচনার বিবরণ দিন।

৭। বৃন্দাবন দাস সম্পর্কে বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তির অভিমত আলোচনা করুন।

৮। চৈতন্যজীবনীকার হিসাবে বৃন্দাবন দাসের স্থান ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৯। বৃন্দাবন দাসের জীবন প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

১০। বাংলা ভাষায় প্রথম চৈতন্যজীবনীকাব্য হিসাবে 'চৈতন্যভাগবত'এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

১২.৯। গ্রন্থপঞ্জি

১. শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত - ড. রাধাগোবিন্দনাথ সম্পাদিত

২. শ্রীচৈত্যভাগবত - ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত

৩. শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত - অধ্যাপক দুর্গাপদ গাঙ্গুলী সম্পাদিত

৪. শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত - প্রণয়কৃষ্ণ বসু সম্পাদিত

৫. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম) - ড. সুকুমার সেন

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য়) - ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম) - ড. ভূদেব চৌধুরী

৮. বাংলার সাহিত্য লোক (১ম) - ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা

৯. শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান - ড. বিমানবিহারী মজুমদার

১০. বৈষ্ণব চরিত সাহিত্য - ড. গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী

একক: ১৩ : চৈতন্যভাগবত: পাঠ ও আস্বাদন

বিন্যাসক্রম

১৩.১। উদ্দেশ্য

১৩.২। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত গদ্যরূপ

১৩.৩। শ্রীচৈতন্য চরিত্র-চিত্রন

১৩.৪। নিত্যানন্দ চরিত্র-চিত্রন

১৩.৫। অন্যান্য চরিত্র-চিত্রন

১৩.৬। নামকরণ প্রসঙ্গ

১৩.৭। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা

১৩.৮। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে সমাজ চিত্র

১৩.৯। অনুশীলনী

১৩.১০। গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১। উদ্দেশ্য

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সার্থক জীবনীগ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'। গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যে দুটি শব্দ আছে একটি 'শ্রীচৈতন্য' অপরটি 'ভাগবত' । শব্দদ্বয়ের মধ্যে 'ভাগবত' শব্দটি প্রাচীন। মূল ভাগবত'-এর রচয়িতা ব্যাসদেব। ব্যাসদেব 'ভাগবত' সম্পর্কে প্রথমেই জানিয়েছেন -

'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভূবি ভাবুকাঃ।।'

বৃন্দাবন দাসও তাঁর 'চৈতন্যভাগবত'-এ 'ভাগবত'এর প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কলির অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে বললেন-

'আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।

সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দড়।।'

দ্বিতীয় শব্দ 'শ্রীচৈতন্য'-এর অর্থ করা যায়- যিনি চৈতন্য, তিনিই ভাগবত বা চৈতন্যরূপী ভাগবত বা ভাগবত রূপী চৈতন্য বা ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য। বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থের নামকরণের বহুমুখী অর্থের দ্বারা এই তত্ত্বকেই প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। যদিও তাঁর গ্রন্থ রচনার কালে বৈষ্ণব সমাজে চৈতন্যদেবের অবতারত্ব বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত। বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্যে শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তা করেছেন ভক্তিভাবময় উচ্ছসিত কাব্য-মাধুর্যের রূপায়ণে। 'ভাগবত'এর আদর্শেই তিনি শ্রীচৈতন্যের জীবনকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

'চৈতন্যভাগবত'এর অন্ত্য খণ্ডটি খুবই সংক্ষিপ্ত এবং হঠাৎ সমাপ্ত। ফলে এই খণ্ডে একটা অসম্পূর্ণতা দেখা যায়। তা ছাড়া পরিব্রাজক শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের প্রসঙ্গটিও তাঁর গ্রন্থে স্থান পায়নি। যাইহোক দোষ-গুণ, ভালো-মন্দর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে 'চৈতন্যভাগবত' পাঠে আপামর বাঙালি সর্বপ্রথম ঈশ্বরের ঐশ্বর্য ও মাধূর্যের ধারণা পেল, ক্ষুদ্র ও বিনাশশীল জীবনে এক অসীম ভাবগম্ভীর প্রেমভক্তিময়, উত্তুঙ্গ মহান জীবনের সন্ধান পেল, প্রতিদিনকার জীবনচর্চা ও জীবনচর্যার অভ্যাসে এক মহান দিব্য অনুভূতির আস্বাদ পেল। ছাত্র- ছাত্রীদের কাছে সেই মহান প্রজ্ঞাময় ভাবদীপ্ত দর্শন-ঋদ্ধ জীবনের কথা জানানোই এই একক-এর উদ্দেশ্য।

১৩.২। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত গদ্যরূপ

চৈতন্যভাগবত তিনটি খণ্ডে বিভক্ত: আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও অন্ত্যখণ্ড:

আদিখণ্ড

আদিখণ্ডে চোদ্দোটি অধ্যায় রয়েছে। এই খণ্ডের উপজীব্য বিষয় হল: চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা, চৈতন্যদেবের জন্ম, শিক্ষা, ও লক্ষ্মীপ্রিয়ার সহিত বিবাহ; তার তর্কযুদ্ধে পণ্ডিতদের পরাস্তকরণ, পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ, লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু, গয়া ভ্রমণ এবং ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ।

মধ্যখণ্ড

মধ্যখণ্ডে সাতাশটি অধ্যায় রয়েছে। এই খণ্ডের উপজীব্য বিষয় হল: চৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয়ে ভক্তির উদয়, ভক্তিধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে তার অনুগামীদের যোগদান, দুষ্ট জগাই ও মাধাইয়ের সঙ্গে কথোপকথন, স্থানীয় শাসক চাঁদ কাজী কৃষ্ণনাম প্রচার নিষিদ্ধ করলে চৈতন্যদেবের আইন অমান্য আন্দোলন (কাজীদলন)।

অন্ত্যখণ্ড

অন্ত্যখণ্ডে রয়েছে দশটি অধ্যায়। এই খণ্ডের মূল উপজীব্য: চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ, শচীমাতার বিলাপ, পুরী ভ্রমণ, ন্যায়শাস্ত্রবিদ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সহিত আলাপ এবং নানা ভক্তের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও আলাপআলোচনা। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের দুটি পুথিতে অন্ত্যখণ্ড-এর শেষে আরও তিনটি অতিরিক্ত অধ্যায় পাওয়া যায়। আধুনিক গবেষকগণ এই অধ্যায়গুলিকে মূল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না।

আদি খন্ডের সংক্ষিপ্ত গদ্যরূপ:

গ্রন্থটি চৈতন্যের শৈশব লীলা এবং তাঁর জন্মের পূর্বে বাংলার অবস্থা থেকে আরম্ভ করে সংসারত্যাগী হয়ে তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত সময়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত। কাহিনিতে রয়েছে সংক্ষিপ্ত ছোট ছোট ইতিবৃত্ত যার মধ্যে পালাক্রমে দুইধরনের আখ্যান পাওয়া যায়। প্রথম ধরনের আখ্যান হলো সে সম্পর্কিত কাহিনী যা অদ্যাবধি বর্তমান চৈতন্যের প্রথম চরিতগ্রন্থ মুরারি গুপ্ত রচিত সংস্কৃত কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম-এ বা মুরারি গুপ্তের কড়চায়

মূল ঘটনাক্রম অনুসারে প্রতিষ্ঠিত। এ আখ্যানমূলক কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে চৈতন্যের জীবনবৃত্তের প্রধান প্রধান ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা, যেমন তাঁর জন্ম, টোলে গমন, প্রথম বিয়ে এবং চৈতন্যকে ঘিরে ভক্ত সম্প্রদায়ের ক্রমান্বয়ে গড়ে ওঠা। দ্বিতীয় ধরনের আখ্যান হলো ওই বর্ণনাত্মক কাঠামোর মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো চৈতন্যের জীবনের প্রতিনিধিত্বমূলক ঘটনার নির্দেশক ক্ষুদ্র কাহিনিমূলক রচনা। এ ক্ষুদ্র উপাখ্যানগুলি ভক্তিবাদের প্রাথমিক পাঠ হিসেবে উপযোগী। এতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে কিভাবে ভক্তিবাদী কর্মের মূল রূপগুলি ফুটে উঠল, যেমন চৈতন্যের সহচর শ্রীবাসের বাড়ির উঠোনে কীর্তনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ঘটে; অথবা কিভাবে ভক্তরা বিভিন্ন পন্থায় মূর্ত প্রেমের নির্ভুল প্রতীককে বরণ করে।

চৈতন্য ভাগবতের তাৎপর্য চৈতন্যের আদি জীবনলীলা বর্ণনার প্রাথমিক উৎস হিসেবে এর ভূমিকাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। গ্রন্থটি সন্তজীবনী রচনার এমন এক মান তৈরি করেছে যা কেবল এর মৌল উপাদান ও সংগঠনের দিক থেকে নয়, ধর্মতত্ত্বের দিক থেকেও পরবর্তী অসংখ্য চৈতন্য চরিতকারের দ্বারা অনুকৃত হয়েছে। বৃন্দাবন দাস দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন চৈতন্য কেবল একজন অবতার নন অর্থাৎ পৃথিবীতে কৃষ্ণের সাধারণ কোনো আগমন ঘটে নি; বরং তিনি স্বয়ং ভগবান, ঈশ্বর, যিনি যুগের প্রয়োজনে ভক্তির নতুন আদর্শ স্থাপন করেছেন। পরবর্তী সকল লেখক চৈতন্যকে ভক্তির রূপাদর্শ ও একই সঙ্গে ভক্তির পাত্র হিসেবে ওই দাবি মেনে নিয়েছেন

সংক্ষেপে বলা যায়, প্রত্যক্ষ ও স্পন্দিত ভাষায় চৈতন্যের আবির্ভাবের অলৌকিক বিস্ময় বর্ণনা চৈতন্য ভাগবতকে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও অধিগম্য ধর্মজীবনী গ্রন্থে পরিণত করেছে। কৃষ্ণদাস নিজেই বার বার বৃন্দাবন দাসকে চৈতন্যের জীবন কথার ব্যাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং সেভাবে তিনি আজও বিশিষ্ট হয়ে আছেন। ভাগবত পুরাণ চৈতন্যের আত্মস্বরূপ কৃষ্ণের জন্য যা করেছে চৈতন্য ভাগবত চৈতন্যের জন্যও তা-ই করেছে।

মূল পাঠটি ইতস্তত ছড়ানো প্রায় একশ সংস্কৃত শ্লোকসহ বারো হাজার তিনশরও (১২,৩০০) বেশি বাংলা পয়ার ও ত্রিপদী চরণ বিশিষ্ট এবং এটি তিন খন্ডে বিভক্ত। আদি খন্ডে শুরু হয়েছে ওই এলাকায় ভক্তিবাদের বিলুপ্তিতে অদ্বৈত আচার্যের দুঃখ প্রকাশ

এবং এ ভাবে তা পাঠককে নিয়ে যায় চৈতন্যের জন্ম ও শৈশব জীবনে যা কৃষ্ণের শৈশব মনে করিয়ে দেয় (১.১-৩), তারপর তরুণ বিশ্বম্ভরের টোলে পাঠ গ্রহণ (১.৪-৫) লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বিয়ে (১.৭) এবং বহু পন্ডিতকে ধরাশায়ী করার (১.৮-৯) বিবরণ। চৈতন্য পূর্ববঙ্গে তাঁর সে বিখ্যাত ভ্রমণে যান, ফিরে আসেন বিপত্নীক হিসেবে এবং পরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করেন। খন্ডটি শেষ হয়েছে পিতার পিন্ড দান করার জন্য চৈতন্যের গয়া ভ্রমণে। এ ভ্রমণে তিনি ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে দেখা করেন এবং দিব্যোন্মাদ (১.১২) হয়ে যান। পাশাপাশি অন্য আখ্যানে নিত্যানন্দের অতীত পটভূমি ও হরিদাসের দুঃখ দুর্দশার (১. ১১) বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

মধ্য খণ্ডের সংক্ষিপ্ত গদ্যরূপ:

মধ্য খণ্ডে গয়া থেকে শ্রীগৌরসুন্দর প্রত্যাবর্তন করলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণ-ব্যাকুলতা বাড়তে লাগল। সমগ্র অঙ্গে অপূর্ব কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ দেখা দিল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে তিনি কাদতে লাগলেন। নিমাই ঔদ্ধত্য, বিদ্যাবিলাস ভুলে কৃষ্ণকথা রসে নিমজ্জিত হলেন। চণ্ডাল, পতিত, অধম পাপী-তাপী সকলকে কৃষ্ণনাম- কৃষ্ণসেবায় অংশগ্রহণ করিয়ে মনে দীনতা-সংকীর্ণতা ঘুচিয়ে পূর্ণ মনুষ্যত্বের সন্ধান দিলেন।

নবদ্বীপে শ্রীবাসের ঘরে শ্রীগৌরাঙ্গ সংকীর্তনে মেতে উঠলেন। মহাপ্রভুর সর্ব অঙ্গে দেখা দিল অষ্ট সাত্তিক ভাব। শ্রীবাস পন্ডিত, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য চিনতে পারলেন সাক্ষাৎ নারায়ণরূপী শ্রীগৌরাঙ্গকে। নবদ্বীপে সংকীর্তনকারী বৈষ্ণবদের উপর রাজবিদ্বেষ বর্ষিত হতে লাগল। গৌরাঙ্গের ঐশ্বর্য প্রকাশে তাঁর স্বরূপ প্রকটিত হল। সস্ত্রীক শ্রীবাসকে চরণপূজার অনুমতি দিলেন, বর প্রার্থনা করতে বললেন, শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীকে কৃপা করলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুর দশাবতারের সব অবতার-স্বরূপের প্রকাশ করলেন নিজ শরীরে। নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য, নিত্যানন্দ-স্বরূপ ও অপূর্ব নিত্যানন্দ-কথা বর্ণনা, নিত্যাননদ প্রভুর বাল্যকালে গৃহ থেকে নিষ্ক্রমণ ও সারা ভারত ব্যাপী ভ্রমণ কথা অতি মনোরমভাবে বর্ণিত হয়েছে। নদিয়ায় নন্দন আচার্যের ঘরে নিত্যানন্দ প্রভু ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপূর্ব মিলন

আখ্যান, এরপর নবদ্বীপের ঘরে ঘরে কীর্তন প্রচার অভিযানের বর্ণনায় সমৃদ্ধ এই খণ্ড। শ্রীবাসের ঘরে ব্যাসপূজার দিন নিত্যানন্দ প্রভু নিজ দণ্ড কমন্ডলু ভেঙে ফেললেন। নিত্যানন্দ প্রভু নানারূপে অশেষ কৌতুকে মহাপ্রভুর সেবা করতে থাকেন। বিচিত্র ভক্ত সমাগমে পূর্ণ এই মধ্য খণ্ড। যেমন- নন্দন আচার্য, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, পুন্ডরীক বিদ্যানিধি, রামাই পন্ডিত, মুকুন্দ-সঞ্জয়, বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য, গঙ্গাদাসপণ্ডিত, খোলাবেচা শ্রীধর, মুরারি গুপ্ত, হরিদাস, শ্রীঅদৈত, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য প্রমুখ।

অষ্টম অধ্যায়ে নৃত্যযোগে শ্রীহরিবাসর অর্থাৎ একাদশীর দিন প্রভুর কীর্তনারম্ভ। মহাপ্রভুর প্রিয় খাদ্যতালিকার বর্ণনা। নবম অধ্যায়ে শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে বিষ্ণুখট্টার উপরে বসে শ্রীগৌরাঙ্গ ঐশ্বর্য প্রকাশ করলেন। সকল ভক্তগণ পরম যত্নে বিবিধ উপচারে প্রভুর শ্রীচরণ সেবা করেন এবং প্রভু সকলকে বরদান করেন। দশম অধ্যায়ে মুকুন্দের প্রতি প্রভুর বিশেষ কৃপা। একাদশ অধ্যায়ে শ্রীবাস-পত্নী মালিনীর শ্রীকৃষ্ণের ঘৃতপাত্র কাকে হরণ করলে নিত্যানন্দের আদেশে কাক ঘৃতপাত্র ফেরত দিলে শোকাকুলা মালিনী স্তম্ভিত হয়ে নিত্যানন্দ স্তব করেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পাপী জগাই-মাধাই-য়ের নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রহার, জাহ্নবীর জলে নিত্যানন্দ-অদ্বৈতসহ সকল গৌরভক্তগণের অপূর্ব জলকেলি। দেবতাগণ সংগোপনে এসব লীলা দেখতে আসেন এবং নিত্য এসে শ্রীচৈতন্যের সেবা করেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে নিত্যাননদ প্রভুকে আঘাত করার জন্য মাধাই-এর তীব্র অনুশোচনা-

'যে অঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র করয়ে বিহার।

হেন অঙ্গে মুঞি পাপী করিনু প্রহার।।'

জগাই-মাধাইকে নিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধার করেন। ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীবাসের ঘরে লুকিয়ে থেকে শ্রীবাসের শাশুড়ি মহাপ্রভুর নৃত্য-কীর্তনাদি দেখার বাসনা করেন। কিন্তু-

'অল্প ভাগ্যে সেই নৃত্য দেখিতে না পাই।।

নাচিতে নাচিতে প্রভু বোলে ঘনে ঘনে।

উল্লাস আমার আজি নাহি কি কারণে ।।'

অবশেষে শ্রীবাস শাশুড়িকে 'আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি করিল বাহির'। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর প্রতি প্রভুর বিশেষ কৃপা। প্রভু বলেন-

'দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম।

আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষু ধর্ম।।'

অষ্টাদশ অধ্যায়ে চন্দ্রশেখর আচার্যর গৃহে প্রভুর নৃত্য-বাসনা, রুক্মিণীহরণ নৃত্যের সাজসজ্জা ও অভিনেতা হিসাবে রুক্মিণীর ভূমিকায় গদাধর, বড়াইয়ের ভূমিকায় নিত্যানন্দ, কোতোয়াল হিসাবে হরিদাস, নারদ হিসাবে শ্রীবাসের পরিকল্পনা সবই শ্রীচৈতন্যের। বিস্তৃত অভিনয়-সজ্জা বর্ণনায় মুখর এই অধ্যায়।

'গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।

রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলা নির্ভর।।'

উনবিংশ অধ্যায়ে শ্রীঅদ্বৈত গৃহে বিলাস প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। তিন প্রভুর ভোজন দৃশ্য অতি চমৎকার-

'অদ্বৈতের হাতে ধরি নিত্যানন্দ সঙ্গে।

চলিলা ভোজন গৃহে বিশ্বম্ভর রঙ্গে।।

ভোজনে বসিলা তিন প্রভু এক ঠাঞি।

বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ আচার্য গোসাঞি।।'

বিংশতম অধ্যায়ে মুরারি গুপ্তের প্রতি বিশেষ কৃপা। পূর্ব লীলায় মুরারি ছিলেন ভক্ত হনুমান।

'হেনমতে মুরারি প্রভুর কৃপাপাত্র।

এ কৃপার পাত্র সবে হনুমান মাত্র।।'

স্বয়ং মহাপ্রভু মুরারির অদ্ভুত আখ্যান ব্যাখ্যা করেন। মুরারি বিষ্ণুভক্ত গরুড়ও। একবিংশ অধ্যায়ে দেবানন্দ দণ্ড অনুগ্রহ। পরম ভাগবত শ্রীবাসের প্রতি ভাগবত পাঠরত দেবানন্দের বিরক্তি প্রকাশে অপরাধের জন্ম ও পরে প্রভুর কৃপায় অপরাধ ভর্জন। দ্বাবিংশ অধ্যায়ে শচীমাতাকে প্রভুর প্রেমদান; ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে পার্ষদ ও ভক্ত সঙ্গে মহাপ্রভুর নগর-কীর্তন ও ভক্তগণকে উপদেশ দান-

'আপনে সভারে প্রভু করে উপদেশে।

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে ।।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

প্রভু বোলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।

ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্বন্ধ।।

ইহা হৈতে সর্ব সিদ্ধ হইব সভার।

সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥'

চতুর্বিংশ অধ্যায়ে অদ্বৈতকে প্রভুর বিশ্বরূপ প্রদর্শন-

'বিশ্বরূপ দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দ।

কাহার নাহিক বাহ্য পরম আনন্দ।।'

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে মহাপ্রভুর বৈরাগ্যভাব ও ষড়বিংশ অধ্যায়ে সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্যোগ ও ভক্তগণের বিরহ, শচীমায়ের বিলাপ, শ্রীধরের আনা লাউ ও অন্য এক ভক্তের আনা দুধ দিয়ে দুধলাউ রান্না করে শচীমা পরমযত্নে শ্রীচৈতন্যকে খাওয়ালেন। মায়ের হাতের রান্না খেয়ে-

'চলিলেন বৈকুণ্ঠ নায়ক গৃহ হইতে।

সন্ন্যাস করিয়া সব জীব উদ্ধারিতে।'

সন্ন্যাস গ্রহণের পর কেশবভারতী প্রভুর নাম রাখলেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।

শেষ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত গদ্যরূপ:

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণের পর কেশবভারতীর পাটে সকল পার্ষদ ভক্তগণদের নিয়ে পরম উল্লাসে নৃত্য-কীর্তনাদি করলেন, গুরু-শিষ্য একত্রে নৃত্য করলেন। মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাওয়ার প্রস্তাবে নবদ্বীপের সকল ভক্তগণ শোকে মুহ্যমান হলেন। প্রভু রাঢ়দেশে এলেন, কিন্তু সেখানে কেউ কীর্তন করে না, ভক্তিহীন রাঢ়দেশ ধন্য হল প্রভুর কৃষ্ণম্ নৃত্য-কীর্তনাদিতে। রাঢ়ের পশ্চিমাভিমুখে চার ক্রোশ পথ বক্রেশ্বর পর্যন্ত গিয়ে প্রভু নীলাচলে যাওয়ার জগন্নাথ-আজ্ঞা পেলেন। ফলে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের ঘরে ফিরে এলেন এবং সেখানে পরম সন্তোষে সকল ভক্তবৃন্দসহ শচীমায়ের রন্ধন ভোজন করলেন। শ্রীঅদ্বৈতের শিশু পুত্র অচ্যুতানন্দকে কৃপা করলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রভু নীলাচলে এলেন নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ, ব্রহ্মানন্দসহ। যাওয়ার সময় রামচন্দ্র খান প্রভুত সহায়তা করেন। আটিসারা, ছত্রভোগ প্রভৃতি স্থান হয়ে প্রভু উৎকলে প্রবেশ করেন। নীলাচলে প্রবেশের পূর্বে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসদণ্ড তিন খণ্ড করে ভেঙে ফেলেন। জলেশ্বর পার হয়ে শান্ত ভক্তদের উদ্ধার করেন এবং রেমুনায় আসেন গোগীনাথ মন্দিরে। সেখান থেকে নীলাচলে আসেন। জগন্নাথ মন্দিরে এসে মূর্ছিত হলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুকে আশ্রয় দেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে 'আত্মা রামশ্চ .....' শ্লোকের তেরো রকম ব্যাখ্যা করেন সার্বভৌম, আর মহাপ্রভু তাঁর পরেও আরও অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করে সার্বভৌমকে যড়ভুজ নারায়ণ রূপে দর্শন দেন। প্রভু ভক্ত সঙ্গে সমুদ্রতীরে স্নিগ্ধ চন্দ্রের আলোয় বসে নৃত্য-কীর্তনাদি করেন। কিছুকাল নীলাচল থেকে প্রভু পুনরায় গৌড় দেশে এলেন। গৌড় দেশে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভাই বিদ্যা বাচস্পতির গৃহে অতিথি হলেন। সেখান থেকে প্রভু গেলেন কুলিয়ানগর। কুলিয়ায় এসে প্রভু সকল পাপীকে উদ্ধার করলেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে নৃত্য-কীর্তনাদি করতে করতে প্রভু মথুরার দিকে যেতে যেতে গঙ্গা তীরবর্তী রামকেলি গ্রামে এলেন। বাংলার শাসক হুসেন শাহ ও মহাপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। রাজপাত্র দবীর খাস ও সাকর মল্লিক অর্থাৎ রূপ-সনাতন প্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। এবারও প্রভু মথুরা না গিয়ে নীলাচল ফিরে যাওয়া মনস্থ করলেন। পুনরায় অদ্বৈত-গৃহে এলেন এবং তাঁর পাঁচ বছরের পুত্র অচ্যুতানন্দের সঙ্গে লীলা করলেন। শচীমাতা ও নবদ্বীপের প্রিয় ভক্তগণ প্রভুকে দেখতে এলেন। প্রভুও পরম কৌতুকে বিচিত্র লীলা প্রকাশ করলেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে প্রভু পুনরায় নীলাচলে গমন করলেন। আসার আগে শ্রীবাসের ঘরে গিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন-

'অদ্বৈতেরে তোমারে আমার এই বর।

জরাগ্রস্ত নাহা দোঁহার কলেবর।'

শ্রীবাসের ঘর হয়ে প্রভু পানিহাটিতে রাঘবের গৃহে এলেন। সেখান থেকে নীলাচলে এসে কাশী মিশ্রের গৃহে অবস্থান করলেন। রাজা প্রতাপ রুদ্রকে কৃপা করলেন। ওড়িয়া-গৌড়িয়া ভক্তদের নিয়ে প্রভু বিবিধ লীলা করলেন। নিত্যানন্দ প্রভু বিবিধ লীলা প্রকাশ করেন। তার মধ্যে দস্যুদের নিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধার করেন।

ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে নিত্যানন্দ প্রভু-

'নিরবধি ভক্তসঙ্গে করেন কীর্তন।

কৃষ্ণ নৃত্যগীত হৈল সবার ভজন।।'

দুই প্রভু ব্রজভাবে বিভোর হয়ে আনন্দ রসসাগরে মত্ত থাকেন। অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন ও পরম সন্তোষে প্রভু অদ্বৈত গৃহে ভোজন করেন। জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে ভক্তি বড়ো - একথা গুরু কেশব ভারতীর মুখ থেকে শুনে প্রভুর অসীম আনন্দ। নৃত্য ও কীর্তনাদিতে ভক্তসঙ্গে উল্লাস ও আনন্দ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। রূপ সনাতনকে প্রভু কৃপা করেন। নবম অধ্যায়ে গদাধরের মুখে প্রভু 'ভাগবত' শ্রবণ করেন।

প্রহ্লাদ চরিত্র ও ধ্রুব চরিত্র প্রভুর অতি প্রিয়। স্বরূপ দামোদরের কীর্তনও প্রভুকে সদা বিহ্বল করে তোলে। পুন্ডরীক বিদ্যানিধি ও প্রভুর রসময় আখ্যান অতীব চমৎকার। দামোদর স্বরূপের কাছে একদিন বিদ্যানিধি জানতে চান - জগন্নাথদেব 'মান্ডুয়া' বস্তু কেন পরিধান করেন? এটা তাঁর কাছে অনাচার বলে মনে হয়। তাঁর সংশয়-যুক্ত হাস্যাবেশ দেখে স্বপ্নে জগন্নাথদেব ও বলভদ্রদেব এসে তাঁর দুগালে চড় মারেন, এইভাবে তাঁর চৈতন্যোদয় ঘটিয়ে জগন্নাথদেব তাঁকে কৃপা করেন। এই পুন্ডরীক বিদ্যানিধিকে মহা বাপ, বলে করেছেন - যিনি পাদস্পর্শ ভয়ে গঙ্গায় স্নান করতেন না।

পরিশিষ্ট

অন্ত্যলীলা : দ্বাদশ অধ্যায়ে মহাপ্রভু সেতুবন্ধ রামেশ্বরে যেতে মনস্থ করেন এবং অত্যন্ত প্রভাতকালে কাউকে না জানিয়ে একলাই রামেশ্বরে গিয়ে শিবকে দন্ডবৎ প্রণাম করেন। দাক্ষিণাত্যে প্রভু বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন ও কৃষ্ণকথারঙ্গে নৃত্যগীতে দিন কাটান। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র অবতারে সমস্ত স্থান ও কাহিনি স্মরণ করেন। বন্দী সপ্ততাল প্রভুর আলিঙ্গনে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠপুরে গেল। প্রভু পুনরায় অদ্বৈত-নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হলেন। এইভাবে বারো বছর প্রভু জগন্নাথ ক্ষেত্রে কাটালেন। বৃন্দাবন যাওয়ার পথে পুনরায় বঙ্গ দেশে এসে অদ্বৈতের গৃহে শচীমায়ের সঙ্গে মিলিত হলেন। প্রভু যখন কাটোয়ায় এলেন, সেখানে রূপ-সনাতন প্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁরা সব সম্পত্তি দান করে বৈরাগী হয়ে প্রভুর সঙ্গে ব্রজগামী হলেন। বৃন্দাবনে গিয়ে মহাপ্রভু প্রথমে মদনগোপাল, পরে গোবিন্দ দেবজিকে দর্শন করলেন। অতি রমণীয় মনোহর ধাম বৃন্দাবনে প্রভু পরম আনন্দে বিহার করলেন।

১৩.৩। শ্রীচৈতন্য চরিত্র-চিত্রন

ইংরাজি ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচী দেবী। মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী জ্যোতিষগণনার দ্বারা জেনেছিলেন - এ শিশু সাধারণ নয়, নারায়ণ অংশে এঁর জন্ম।

ক্রমশ জীবন যত এগিয়েছে লৌকিক ও অলৌকিক মিলিয়ে ততই তাঁর জীবন বিচিত্র ঘটনাবহুল রহস্যময় ও তত্বজ্ঞ হয়ে উঠেছে। শ্রীচৈতন্যদেব জীবিতকালেই তাঁর ভক্তদের কাছে অবতার, হয়ে উঠেছিলেন, যদিও তিনি নিজে একথা প্রকাশ ও প্রচারে ঘোর আপত্তি জানাতেন ও ক্রুদ্ধ হতেন। পুরীতে থাকাকালীন স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য চৈতন্য অবতারের বন্দনা করে সর্বপ্রথম 'চৈতন্যের গীত' করে জানিয়েছিলো-

'শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর।

দীন দুঃখিতের বন্ধু মোরে দয়া কর।।'

(চৈ. ভা. ৩/১০)

মানবশিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও আসলে তিনি মানবরূপে ভগবান- বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থে, এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর ''আজানুলম্বিত' দীর্ঘ বাহু সমন্বিত দীর্ঘদেহ, তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, উন্নত উজ্জ্বল রসাত্মক সাত্ত্বিক ভাবরাশি তাঁর পূর্ণতম ঐশ্বর্য ও মাধুর্যময় দেবসত্তাকেই প্রকাশ করে।

তবে শ্রীচৈতন্যদেবের দেবসত্তার পাশাপাশি তাঁর মানব সত্তাও কম আকর্ষক নয়। এই প্রথম মধ্যযুগের অলৌকিক কাল্পনিক দৈববাদকে সরিয়ে রক্ত-মাংসের একজন অতি পরিচিত মানুষ বাস্তবের আঙিনায় মানুষের অনন্ত চাওয়া-পাওয়া, হিসেক-নিকেশের মাঝে প্রেমের ফুল ফোটালেন। অলৌকিকতা নয়, অনায়াস লব্ধ কোনো আধ্যাত্মিক শঠতা নয়, নিত্যদিনের চর্চার মধ্য দিয়ে নিতান্ত সাধারণ ঘরে, সাধারণ জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে প্রেমোপলব্ধির অসাধারণত্বে উন্নীত হওয়ার বাস্তবসম্মত বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক জীবনের সন্ধান দিলেন। এটাই তাঁর মানবসত্তার অভিনবত্ব।

অসাধারণ মেধা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী শ্রীগৌরাঙ্গ সাধারণ মানুষের মতোই বিদ্যাবিলাস ও লীলা চাপল্যে এমনভাবে দিন কাটিয়েছেন যে বিন্দুমাত্র বোঝার উপায় নেই এ শিশুই নররূপে নারায়ণ। এটাই তাঁর ঐশ্বর্যর প্রকাশ। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে আত্মপ্রকাশের কালেই ঘটে তাঁর ঐশ্বর্যের পূর্ণ পরিচয় । কিন্তু ঐশ্বর্যই ভগবত্তার সার নয়, মাধুর্যই ভগবত্তার সার। এবার সেই মাধুর্যের পরিপূর্ণ আস্বাদন তিনি নিজে করেছেন এবং

আপামর জনসাধারণকে করিয়েছেন ও করার অধিকার দিয়েছেন অর্থাৎ ‘সেই প্রেম দিল যথা তথা’।

শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তি আন্দোলন তৎকালীন বিদ্বান-পন্ডিত, লেখক-কবি-নৃত্যগীতশিল্পী সকলকেই প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ পরিকরদের অনেকেই তাঁর মানবসত্তা-দেবসত্তার বিচিত্র বর্ণনা দিয়ে নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। বৃন্দাবন দাস ‘চৈতন্যভাগবত’-এ তাঁর উভয় সত্তাকেই পরিস্ফুটিত করেছেন। তবে মানব-সত্তার অন্তরালে তাঁর দেবসত্তাই যে মুখ্য সেটা বৃন্দাবন দাস বর্ণনা করতে দ্বিধা করেন নি।

শ্রীচেতন্যের মানবসত্তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত - তিনি সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করতেন। নিতান্ত দীন-হীন দরিদ্র নিম্নবর্ণের নানা বৃত্তিধারী মানুষের সঙ্গেও তাঁর মেলামেশা ও সুসম্পর্ক ছিল। নিজে অতি 'সুদরিদ্র’ ঘরে জন্মগ্রহণ করে সমাজের অতি সাধারণ দরিদ্র মানুষদের তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে- ভগবদ্ভক্তিতে দারিদ্র্য কোনো বাধা নয়, ‘কৃষ্ণভজনে নাই জাত কুলাদি বিচার’- এই উক্তির দ্বারা বোঝানো হয়েছে সকল শ্রেণির মানুষেরাই ভগবদ্ভজনের অধিকারী। হরিনাম সংকীর্তনের মন্ত্রে আপামর জনগণকে ভক্তি আন্দোলনের দ্বারা তিনি উদ্বুদ্ধ করলেন। পতিত পাপী-তাগী মূর্খ-চণ্ডাল সকলকে হীনতা-অবহেলা-নিপীড়ন থেকে মুক্তির আলোক ধারায় এনে প্রেমভক্তির বারিতে স্নান করালেন। বৃন্দাবন দাসের ভাষায়-

‘ধর্ম পরাভব হয় যখনে যখনে।

অধর্মের প্রভাবতা বাড়ে দিনে দিনে ।।

সাধুজন রক্ষা দুষ্ট বিনাশ কারণে।

ব্রহ্মা আদি প্রভুর পার করেন নিবেদনে।।

কিংবা

‘কালযুগে সর্বধর্ম হরি সংকীর্তন।

সব প্রকাশিলেন শ্রীচৈতন্য নারায়ণ ॥

কলিযুগে সংকীর্তন ধর্ম পালিবারে।

অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্বপরিকরে।।'

বৃন্দাবন দাস যেটা বলেননি, সেটা হল শ্রীচৈতন্যের রাধাভাবে ভাবিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রেম আস্বাদন - এটাই তাঁর দৈবীসত্তার চরম প্রকাশ।

১৩.৪। নিত্যানন্দ চরিত্র-চিত্রন

বীরভূমের একচক্রা গ্রামে আনুমানিক ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দের মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম 'হাড়াই পণ্ডিত' এবং মায়ের নাম 'পদ্মাবতী'।

বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত', গ্রন্থে জানিয়েছেন মাত্র বারো বছর বয়সে নিত্যানন্দ গৃহত্যাগ করেন এবং দীর্ঘ বিশ বছর তিনি ভারতবর্ষের নানা তীর্থ পর্যটন করেন। তীর্থ পর্যটনকালে দক্ষিণ ভারতে উপনীত হলে সেখানে মাধবেন্দ্র পুরী পাদের সান্নিধ্যে আসেন এবং প্রেমোন্মত্ত হয়ে ওঠেন। নিত্যানন্দ প্রভুকে 'অবধূত' বিশেষণে ভূষিত করা হয় ।

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রথম সাক্ষাৎ হয় নন্দন আচার্যের গৃহে, পরে নিত্যানন্দসহ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসের গৃহে প্রায়শই সংকীর্তন করতেন। নিত্যানন্দের সঙ্গে বিশ্বরূপের মিল থাকায় শচীমাতা নিত্যানন্দ প্রভুকে বিশেষ স্নেহ করতেন।

দুই প্রভুর মিলনে নবদ্বীপে কৃষ্ণভক্তি আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করতে লাগল। কারণ মুখ্যত নিত্যানন্দ প্রভুই ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তি আন্দোলনের প্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পাষদ। মহাপ্রভু নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে নিত্যানন্দ দ্বারাই জগাই-মাধাইকে কৃপা করলেন। 'স্বতন্ত্র ঈশ্বর' শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিত্যানন্দের মহিমা উজ্জল করবার জন্যই নিত্যানন্দের 'করুণাধারা'র পাশে নিজের 'ক্রোধাগ্নি' প্রকাশ করলেন। মহাপ্রভু বললেন – 'নিত্যানন্দ আমার অভিন্ন কলেবর' এবং 'আমার সকল কর্ম নিত্যানন্দ দ্বারে।'

'অতি গুঢ় নিত্যানন্দ চরিত'। নন্দ আচার্যের গৃহে দুই প্রভুর মিলনের কালে মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীবাস পণ্ডিত কৃষ্ণধ্যান বিষয়ক একটি শ্লোক পাঠ করলে প্রভু নিত্যানন্দ ভূমিতে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তাঁর সর্বাঙ্গ অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। বৃন্দাবন দাসের ভাষায়:

'গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।

কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে।।

বিশ্বম্ভর মুখ চাহি ছাড়ে ঘনশ্বাস।

অন্তরে আনন্দ, ক্ষণে ক্ষণে মহা-হাস।।

ক্ষণে নৃত্য ক্ষণে গান ক্ষণে বাহুতাল।

ক্ষণে জোরে জোরে লম্ফ দেই দেখি ভাল।।

দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ উন্মাদ-আনন্দ।

সকল বৈষ্ণব সঙ্গে কান্দে গৌরচন্দ্র।।'

নারায়ণের দ্বিতীয় কায়ব্যূহ সংকষর্ণই শ্রীবলরাম, তিনিই কলিতে শ্রীমন নিত্যানন্দ। শ্রীনিত্যানন্দই বলরাম স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বকে প্রকাশ ও অনুভববেদ্য করে তোলেন। তিনিই গুরু রূপে জগৎ ও জীবকে কৃপা করেন। আবার অবতাররূপে, ভক্তরূপে, শক্তিরূপে এবং সেবা-উপকরণ রূপে (শ্রীখোল-করতাল-বসন-ভূষণ-শয়ন-শয্যা-ছত্র-পাদুকা-বাসন প্রভৃতি) শ্রীভগবানের সেবা করেন। নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতিরেকে জগৎ ও জীবের উদ্ধার নেই। নিত্যানন্দ সম্পর্কে শ্রীমহাপ্রভু নিজ মুখে বলেন-

'বেদের অগম্য নিত্যানন্দ চরিত্র।

সর্বজীব-জনক রক্ষক সর্ব মিত্র।

ইহান ব্যভার সব কৃষ্ণ রসময়।

ইহানে সেবিলে কৃষ্ণ প্রেমভক্তি হয়।।'

মহাপ্রভুর কৃপা-আদেশ নিয়ে নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়বঙ্গে নাম-সংকীর্তন আন্দোলনে প্রেমবন্যা আনলেন। চণ্ডাল পতিত জনের ঘরে ঘরে গিয়ে হরিনাম মহামন্ত্র বিতরণ করলেন। মূর্খ-নীচ-পতিত দুঃখিত সকলকে প্রেমভক্তি দান করে উদ্ধার করলেন।

নিত্যানন্দের দ্বারা মহাপ্রভু বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। তাই নিত্যানন্দকে আমরা-

(ক) সমাজ-সংস্কারক রূপে পেয়েছি,

(খ) নিত্যানন্দ প্রভুই নারীমুক্তির প্রথম অগ্রদূত,

(গ) নিত্যানন্দই প্রথম বিপ্লবী, প্রথম সফল গণনায়ক,

(ঘ) নিত্যানন্দ দুঃখী, নিরন্ন, নিরাশ্রয়, অসহায়, আর্তজনের বন্ধু,

(ঙ) ছাত্র ও যুবসমাজের জন্য কীর্তন ছাড়াও শরীরচর্চা কেন্দ্র, বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র গঠন করে তিনি আদর্শ মানব জাতি গঠন করতে চেয়েছিলেন,

(চ) আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভু ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মনুষ্যত্বের বাণী, মহাপ্রভুর প্রেম ভক্তিবাদ। তাই নিত্যানন্দ প্রভু সম্পর্কে বৈষ্ণব কবি বলেন-

‘যে জন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়

সে শরণ লউক নিতাইচাঁদের অরুণ দুখানি পায়।

যে নিতাই বলিয়া কাঁদে

জ্ঞানদাস কহে গৌরাঙ্গ পদ সেই হিয়ার মাঝারে বাঁধে ।।’

১৩.৫। অন্যান্য চরিত্র-চিত্রন

বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’, গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের লৌকিক ও অলৌকিক দিব্যজীবনের পাশাপাশি তাঁর পার্ষদ ভক্তবৃন্দের চরিত্রও কম আকর্ষনীয় নয় । বরং বলা যায়, শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ ভক্তবৃন্দের অপূর্ব শুদ্ধ চরিত-পুষ্পে গাঁথা মালাই যেন শ্রীচৈতন্য

চরণে নিবেদিত হয়ে ভক্তি অর্ঘ্যের উপকরণ সজ্জিত হয়েছে। এইসকল চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চরিত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

শ্রীঅদ্বৈত :

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের অন্যতম হেতু স্বরূপ বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে 'গীতা' সূত্র ধরে ধর্মের পরাভব, অধর্মের প্রভাব, সাধুজন রক্ষা, দুষ্টের দমন, যুগধর্ম স্থাপনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। ভগবান শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-কামনায় ভক্তের এই আকুল আহ্বানটি 'চৈতন্যভাগবত'-এ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কণ্ঠে প্রবলভাবে ধ্বনিত হয়েছে। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন-

'অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।

সেই প্রভু কহিয়া আছেন বারবার।।'

অদ্বৈত আচার্য নবদ্বীপের সমগ্র বৈষ্ণব সমাজে ছিলেন 'বৈষ্ণবাগ্রগণ্য'। তিনি ছিলেন-

'জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।

কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর।।'

তাঁর সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস আরও বলেছেন-

'ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্র-পরচার।

সর্বত্র বাখানে কৃষ্ণপদ-ভক্তিসার॥'

তুলসী মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে।

নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা কুতূহলে।।'

পঞ্চতত্ত্বে শ্রীঅদ্বৈত 'ভক্তাবতার'। শ্রীগৌরাঙ্গের থেকে প্রায় বাহান্ন বছরের-বড়ো অদ্বৈত আচার্য 'ব্যবহার রসে মত্ত' কৃষ্ণভক্তিশূন্য নবদ্ধীপে নানা অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অবহেলা, ঈর্ধা-বিদ্বেষ, উপহাস সহ্য করেও সুগভীর নিষ্ঠায় ও দৃঢ় বিশ্বাসে অটল ছিলেন বৈকুণ্ঠাধিপতি

নারায়ণ ভূ-ভার হরণ করার জন্য অবতীর্ণ হবেনই। তাঁর সেই সংকল্প ও বিশ্বাস বিফলে যায়নি। সত্যিই জীবের দুঃখ মোচন করতে সর্বজীবকে প্রেমভক্তিতে শুদ্ধ করতে শ্রীহরি অর্থাৎ চৈতন্যদেব আবির্ভূত হলেন। 'মহাবিষ্ণুর অবতার' অদ্বৈত সম্পর্কে মহাপ্রভুর উক্তি-

'অদ্বৈতের প্রসাদে সে হয় কৃষ্ণভক্তি।

জানিহ অদ্বৈতে কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি।।'

অদ্বৈত আচার্যের আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্টের লাওড় গ্রাম। শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈত আচার্যকে আদর করে 'নাড়া' বলে ডাকতেন। মধ্য ও অন্ত্য খণ্ডের নানা স্থানে 'নাড়া' শব্দের ব্যবহার দেখে অনুমান করা যায় শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈতের অতি সহজ মধুর সম্পর্ক ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রথম এই অদ্বৈত আচার্যের গৃহেই নিয়ে আসেন। ভক্তের জন্যই যে ভগবানের আবির্ভাব - "মোর লাগি প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া" অদ্বৈতের এই বাক্যটিই তার প্রমাণ দেয়।

অদ্বৈতের কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণাবতার বলেই বিশ্বাস করতেন। মহাপ্রভু অপ্রকট হওয়ার পরও তিনি কিছুকাল জীবিত ছিলেন। কারও কারও মতে তিনি ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে ইহলীলা সাঙ্গ করেন।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত :

পঞ্চ তত্ত্বে শ্রীগদাধর হলেন 'ভক্তসাত্ত্বিক' বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত'- এ গদাধরের স্বরূপ জ্ঞাপনে বলেছেন- 'সত্য সত্য গদাধর কৃষের প্রকৃতি'। এমনকি-

'আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারবার।

গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার ॥'

'প্রকৃতি' এবং 'পরিবার' এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা বৃন্দাবন দাস শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিকরের অর্থাৎ চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তির কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর অর্থাৎ চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ শক্তি হলেন শ্রীরাধিকাদি সখীগণ। গদাধর তেমনই নবদ্বীপ লীলায় শ্রীকৃষ্ণরূপী শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ শক্তি। কবি কর্ণপুরও গদাধরকে শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ শক্তি

রূপেই আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ তত্ত্বত গদাধর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের ব্রজলীলার পরিবার বা বধূ শ্রীরাধা স্বরূপ।

শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুরীধামে চলে এলে গদাধরও চলে আসেন এবং টোটা গোগীনাথ মন্দিরের সেবাভার গ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর নির্দেশে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি গোপীনাথের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত :

শ্রীবাস পণ্ডিত পঞ্চতত্ত্বের 'ভক্তাখ্য'। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের অনেক আগেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর আদি নিবাস পূর্ববঙ্গে। গয়াধাম থেকে ফিরে শ্রীচৈতন্য এই শ্রীবাসের গৃহে প্রথম রুদ্ধদ্বার সংকীর্তন করতেন। 'চৈতন্যভাগবত'-এর স্রষ্টা শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর সন্তান।

শ্রীবাস পন্ডিতেরা চার ভাই এবং এই চার ভাই-ই শ্রীচৈতন্যের কৃপাধন্য ছিলেন। এই চার ভাইয়ের নাম হল- শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে উল্লেখ আছে - এই চার ভাইয়েরও বড় এক ভাই ছিলেন, তাঁর নাম নলিন পণ্ডিত, নারায়ণী তাঁরই কন্যা। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থ থেকে জনা যায় নারায়ণীর সঙ্গে কুমারহট্টের বিপ্র বৈকুণ্ঠনাথের বিবাহ হয়েছিল। গয়া থেকে ফেরার কিছুকাল পর শ্রীবাসের গৃহেই মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ ঘটে।

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুরীধাম থেকে বঙ্গদেশে এসে তাঁর গুরুগৃহ কুমারহট্টে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পাটে এসেছিলেন। এই কুমারহট্টেও ছিল শ্রীবাস পণ্ডিতের বাস। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবাসের সঙ্গে পুনরায় এখানে মিলিত হয়ে অতি দরিদ্র শ্রীবাস পন্ডিতকে আশীর্বাণী করেছিলেন তাঁর অন্নকষ্ট যাতে লাঘব হয়। শ্রীবাসের নবদ্বীপের বাড়িতে মহাপ্রভুর সংকীর্তন কালে ঈর্ষাপরায়ণ বিপ্র চাপাল-গোপাল শ্রীবাসকে অপদস্থ ও ভন্ড প্রমাণ করতে তাঁর গৃহের সামনে মদ্য-মাংস-জবা-হলুদ রেখেছিলেন। এই ঘটনার দিন কয়েক পরই চাপালের কুষ্ঠব্যাধি হয়। কুলিয়া পাটের দেবানন্দ পন্ডিতও ভক্ত শিরোমণি শ্রীবাসকে যোগ্য মর্যাদা না দেওয়ায় অপরাধী হয়েছিলেন। শ্রীবাসচরণে অপরাধী এই

সকল ভক্তবৃন্দকে অপরাধভঞ্জন স্থান কুলিয়ায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উদ্ধার করেছিলেন। এইসব ঘটনায় প্রমাণ হয় - ভক্তচরণে অপরাধ হলে তাঁর দুঃখের সীমা থাকে না । পরম দয়াল 'ভক্তাখ্য' শ্রীবাসের পাপী-তাপী-পতিত জনের প্রতি যে কী করুণা, কী স্নেহধারা - এতে তাঁর পরম উদারতা পূর্ণ মানবিকতার দিকই প্রকাশ পায়।

শ্রী হরিদাস :

হরিদাসের জন্ম পূর্ব বঙ্গের বুঢ়ন গ্রামে। পরবর্তীকালে গঙ্গার তীরে শান্তিপুরের কাছে ফুলিয়া গ্রামে তিনি অবস্থান করেন। পরম ভাগবত হরিদাস ঠাকুর সদাই কৃষ্ণনামে বিভোর থাকতেন। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের সঙ্গ পেয়ে কৃষ্ণকথা আস্বাদনে তাঁর আনন্দ যেন কোটি গুণ বৃদ্ধি পেল। তিনি সর্বদা উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্তন করতেন। কৃষ্ণ কথায় নৃত্য করতে করতে তিনি বাহ্য জ্ঞান হারাতেন।

হরিদাসের জন্মপরিচয় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মত আছে। কেউ বলেন তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম গ্রহণ করে অতি শৈশবেই পিতৃমাতৃহারা হয়ে মুসলমানের ঘরে লালিত-পালিত হন। আবার কেউ বলেন, তিনি মুসলমানের ঘরেই জন্মগ্রহণ করেছেন। যাইহোক না কেন, তিনি যে কৃষ্ণানুরাগী ছিলেন এবং সর্বক্ষণ হরিনাম সংকীর্তনে বিভোর থাকতেন এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। এই হরিনাম সংকীর্তনের জন্যই মুসলমান শাসকদের দ্বারা তাঁকে অত্যাচারিত হতে হয়েছিল। 'নাম' ও 'নামী' যে অভিন্ন এ কথা বোঝাতে হরিদাস ঠাকুর বলেন-

'খণ্ড খণ্ড করি দেহ যদি যায় প্রাণ।

তভো আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম।।'

বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত'এ হরিদাসের পিতামাতার নাম উল্লেখ না করলেও একটা সংক্ষিপ্ত জন্ম পরিচয় দিয়েছেন এবং হরিদাসের কুলপরিচয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন-

'জাতি কুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।

জন্মিলেন নীচকুলে ঈশ্বর আজ্ঞাতে।।'

বৃন্দাবন দাসের মতে, হরিদাস ছিলেন শ্রীচৈতন্য পার্ষদভক্ত। হরিদাস শ্রীচৈতন্য অদ্বৈতাদির সঙ্গে একসময় কৃষ্ণলীলা পালায় অভিনয়ও করেছিলেন। তিনি সর্বক্ষণ হরিনামে মত্ত থাকতেন বলে তাঁকে বলা হয় নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর। কৃষ্ণভক্তির সকল লক্ষণ তাঁর শরীরে প্রকটিত হত।

'অশ্রপাত রোম হর্ষ হাস্য মূচ্ছা ঘর্ম।

কৃষ্ণভক্তি বিকারের যত আছে মর্ম।।'

এইভাবেই হরিদাস কৃষ্ণনাম জপ করে সকলকে নামের মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট করতেন এবং বলতেন 'নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়'। তাই বৃন্দাবন দাসও লিখেছেন- 'সত্য সত্য হরিদাস জগত ঈশ্বর'।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য :

তৎকালীন ভারতবর্ষের বিখ্যাত বৈদান্তিক পণ্ডিত। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশের নবদ্বীপের বাসিন্দা হলেও পরবর্তীকালে ওড়িশার রাজা প্রতাপ রুদ্রের রাজপন্ডিত হন। ইনিই জগন্নাথ মন্দিরে মূর্ছিত মহাপ্রভুকে নিজ গৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহরে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান এলে সমুদ্র স্নান করে এসে ভিক্ষা (আহার) করলেন। মহাপ্রসাদান্ন আনিয়ে সার্বভৌমই সেদিন প্রভুকে ভিক্ষা দিয়েছিলেন। গোপীনাথ আচার্যের কাছ থেকে সার্বভৌম মহাপ্রভুর পূর্বাশ্রমের পরিচয় জেনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং জানলেন ইনি 'বৈষ্ণব সন্ন্যাসী'। মহাপ্রভু সার্বভৌমকে বিনীতভাবে বলেছিলেন-

'তুনি জগদ্‌গুরু সর্বলোক হিতকর্তা।

বেদান্ত পড়াও সন্ন্যাসীর উপকর্তা।।

আমি বালক সন্ন্যাসী - ভালমন্দ নাহি জানি।

তোমার আশ্রয় নিল - গুরু করি মানি।।

তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন।

সর্বপ্রকারে আমায় করিয়ে পালন।।'

সার্বভৌম নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ধর্ম কীভাবে রক্ষা হবে - সেকথা ভেবে চিন্তিত হয়েছিলেন। এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রভুকে বেদান্ত শ্রবণ করাবেন এবং অদ্বৈত মার্গে প্রবেশ করাবেন। সাতদিন ধরে প্রভুকে বেদান্ত শোনালেন কিন্তু প্রভু নীরব হয়ে রইলেন। অবশেষে প্রভু বললেন-

'সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।

কল্পনা অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন।।

মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা ।

অভিধাবৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা।।'

সার্বভৌম শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ-ভাষ্যের সাহায্যে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করেছিলেন, মহাপ্রভু তা খণ্ডন করেন। মহাপ্রভুর ব্যাখ্যা শুনে সার্বভৌম বিস্মিত হন এবং অনুভব করেন ইনিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তখন মহাপ্রভু কৃপা করে তাঁকে চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করান। সেই থেকে সার্বভৌম প্রভুর পরম ভক্ত হন।

দামোদর স্বরূপ :

ইনি মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলার সঙ্গী ছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য। ইনি মহাপ্রভুর একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত, পূর্ব লীলায় ছিলেন ললিতা সখী। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করলে তিনি মনোদুঃখে বারাণসীতে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তখন তাঁর নাম হয় দামোদর স্বরূপ। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষে নীলাচলে ফিরে এলে স্বরূপ দামোদর বারাণসী থেকে নীলাচলে এসে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। ইনি ছিলেন মধুর কণ্ঠের অধিকারী, ভক্তিরস বিষয়ে পরম-নিপুণ এবং সংগীত বিশারদ, মহাপ্রভুর শেষ

লীলা অর্থাৎ গম্ভীরা লীলার সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন তিনি। বঙ্গদেশের সপ্তগ্রামের ভক্ত রঘুনাথ দাস পুরীতে এলে মহাপ্রভু রঘুনাথকে স্বরূপের হাতে অর্পণ করে বলেছিলেন- 'আজ থেকে এঁর নাম স্বরূপের রঘুনাথ'। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে 'চৈতন্যচরিতামৃত'এর স্রষ্টা কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথ দাসের নিকট থেকেই মহাপ্রভুর গম্ভীরা লীলার অত্যন্ত গুঢ় তত্ব জানতে পেরেছিলেন, যা বৃন্দাবন দাসের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

রায় রামানন্দ :

রামানন্দ রায় ছিলেন ওড়িশাধিপতি রাজা প্রতাপ রুদ্রের অধীনে রাজমহেন্দ্রী প্রদেশের শাসনকর্তা, মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ে রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে রামানন্দের মুখে 'সাধ্য-সাধন তত্ত্ব' এবং শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা প্রকাশ করিয়ে তা আস্বাদন করে পরমানন্দ অনুভব করেছিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছাতেই রামানন্দ রাজকার্য পরিত্যাগ করে নীলাচলে প্রভুর চরণ সান্নিধ্যে এসে প্রভুর গম্ভীরা লীলার সর্বক্ষণের সঙ্গী হন। রামানন্দ ছিলেন মহাপন্ডিত এবং পরম ভাগবত। ইনি পূর্ব লীলায় ছিলেন বিশাখা সখী। রামানন্দ নাট্যকারও ছিলেন। তিনি 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটক রচনা করে নিজে নির্দেশক হয়ে দেবদাসীদের দিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন। গম্ভীরা লীলায় দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মহাপ্রভু-

'এই মত দিনে দিনে স্বরূপ-রামানন্দ সনে

নিজ ভাব করেন বিদিত।

বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে আনান্দময়

কৃষ্ণ প্রেমের অদ্ভুত চরিত।।'

(চৈঃ চঃ)।

১৩.৬। নামকরণ প্রসঙ্গ

'চৈতন্যভাগবত', গ্রন্থের নামকরণ নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর নিত্যানন্দ দাস রচিত 'প্রেমবিলাস' কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের

কিছু মন্তব্য এবং বিশিষ্ট সমালোচক ড. বিমানবিহারী মজুমদারের দেওয়া তথ্যকে ভিত্তি করেই নামকরণ বিতর্ক জটিল হয়েছে। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে বলা হয়েছে-

'চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।

বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল।।'

সুতরাং গ্রন্থটির আদি নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' না 'চৈতন্যভাগবত' তা নিরূপণ করা কঠিন। 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' নামক গ্রন্থে আছে বৃন্দাবন দাস ও লোচন দাস উভয় কবির গ্রন্থের নামই ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল'। ফলে বিভ্রান্তি এড়াতে বৃন্দাবন দাস নিজের গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যভাগবত' রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বৃন্দাবন দাসের পরবরতীকালের বৈষ্ণব দার্শনিক কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত, গ্রন্থের সর্বত্র বৃন্দাবন দাস রচিত গ্রন্থকে 'চৈতন্যমঙ্গল' বলেই উল্লেখ করেছেন। তাই অনেকে মনে করেন, 'ভাগবত' নামটি 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনার পরে যোগ করা হয়েছে। কৃষ্ণদাস লিখেছেন-

'কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।

চৈতন্যচরিতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।।'

আবার বৃন্দাবন দাসের সমকালীন কবি লোচন দাস নিজেই তাঁর গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থটির 'চৈতন্যভাগবত' নামটির উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন -

'শ্রীবৃন্দাবন দাস বন্দিব এক চিতে।

জগৎ মোহিত যার ভাগবত গীতে।।'

কবি জয়ানন্দও বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'এর নাম করেছেন। আবার ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মত অনেকটাই প্রেমবিলাসের অনুরূপ। লোচন দাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-এর প্রতি বৃন্দাবন দাস অত্যন্ত প্রীত হয়ে নিজেই লোচন দাসকে বলেছিলেন, "অদ্য হইতে তোমার গ্রন্থের নাম চৈতন্যমঙ্গল এবং আমার চৈতন্যমঙ্গলের নাম চৈতন্যভাগবত হইল"। আবার জনশ্রুতি আছে, বৃন্দাবন দাস তাঁর মা নারায়ণী দেবীর অনুরোধে 'চৈতন্যমঙ্গল' নাম পরিবর্তন করে 'চৈতন্যভাগবত' রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সুতরাং গ্রন্থখানির বৃন্দাবনকৃত নাম 'চৈতন্যভাগবত'ই ছিল। 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল না - একথা বলা যেতেই পারে।

আবার কারও কারও মতে, বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যভাগবত'ই ছিল, কোনোদিনই 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল না। সুকুমার সেনের মতে, কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতে ব্যাস বৃন্দাবস দাস'- এই উক্তি থেকেই বোধ হয় বৈষ্ণব সমাজে 'চৈতন্যভাগবত' নামটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃন্দাবন দাস নিজেও তাঁর গ্রন্থে একাধিক বার নিজেকে ব্যাস বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যাসদেব যেমন 'ভাগবত', প্রণেতা, তেমনই বৃন্দাবনও ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন তা 'ভাগবত'এরই সমান অর্থাৎ তা 'চৈতন্যভাগবত'ই এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় গ্রন্থটির নাম 'চৈতন্যভাগবত'ই ছিল, আর কবিরাজ গোস্বামী যে বারবার 'চৈতন্যমঙ্গল' বলে উল্লেখ করেছেন তা হয়তো গ্রন্থটি চৈতন্যমাহাত্ম্যসূচক বলে মধ্যযুগীয় ধারায় 'মঙ্গল' অভিধায় ভূষিত করার জন্যই। বৃন্দাবন দাস নিজেও শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্যসূচক সংকীর্তনকে 'চৈতন্যমঙ্গল' সংকীর্তন বলেছেন, নিত্যানন্দ এবং গদাধর প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন-

'তবে দুই প্রভু স্থির হই একস্থানে।

বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল সংকীর্তনে।।'

কবিরাজ গোস্বামী এ কারণেই গ্রন্থটিকে 'চৈতন্যমঙ্গল' বলে উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' নামক কোনো চৈতন্যজীবনীর পুঁথি আজ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায়নি।

১৩.৭। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা

বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত'এ ভক্তি ও অনুরাগরঞ্জিত দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্যদেবের যে আচরণের বর্ণনা দিয়েছেন, তা ভারতীয় আধুনিক ভাষার সাহিত্যে অভিনব। ফলে এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

বৃন্দাবন দাস তাঁর জন্মসাল বা গ্রন্থরচনার কাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য না জানালেও এমন অনেক ঐতিহাসিক তথ্য বা ইতিহাসের তথ্য-সংকেত দিয়েছেন যা ইতোপূর্বে অন্য কৌনো

গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এসব তথ্য-সংকেত শুধু ইতিহাসের ঘটনা বিষয়কে কেন্দ্র করেই নয়, সমসাময়িক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়কে কেন্দ্র করেও রয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার এমন কিছু ইঙ্গিত আছে যা অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যেমন, হিন্দুরা মুসলমানদের স্পর্শ করা অন্ন আহার করত না, আবার মুসলমানদের ব্যবহার ছিল আরও বাড়াবাড়ি রকমের-

'আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত'।

অথচ রামকথা শুনতে মুসলমানদের আগ্রহ ছিল প্রবল-

'যেন পিতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে

নির্ভয়ে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে।

যবনেও যার কীর্তি শ্রদ্ধা করি শুনে

ভজো হেন রাঘবেন্দ্ প্রভুর চরণে।'

বৃন্দাবন দাসের আগে অন্য কোনো কবি বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক দেবতার পূজার উল্লেখ করেন নি। 'মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে'- এই উক্তির মধ্যে তারই প্রমাণ মেলে।

ড. সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন - বর্ধমান জেলার কোনো কোনো অঞ্চলে এখনও খুব ধুমধাম করে পুতুল প্রতিমা গড়ে জগদ্‌গৌরীর (অর্থাৎ মনসার) পূজা অনুষ্ঠান হয়। এরও ইঙ্গিত 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে বৃন্দাবন দাস দিয়েছেন। যেমন, বিষহরি দেবীর পূজা উপলক্ষ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন-

'পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন।'

চণ্ডীমঙ্গলের গান শুনতে মানুষের আগ্রহের ইঙ্গিত ও কবি তাঁর গ্রন্থে প্রদান করেছেন-

'ধর্ম কর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।

মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।।'

কিছু কিছু লোকগীতির উল্লেখও তিনি করেছেন। যেমন-

‘যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত

ইহা শুনিবারে সর্বলোক আনন্দিত।’

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে এদেশে নাট্যাভিনয় কেমন করে হত তার বিবরণ কেবল ‘চৈতন্যভাগবত’-এই পাওয়া যায়। একবার শ্রীচৈতন্যদেব ব্রজলীলার মাথুর বিরহের সঙ্গে রুক্মিণীর অনুরাগ মেশানো একটি পালায় অভিনয় করেছিলেন। চৈতন্যদেবের ভাবাবেগের দরুণ এই অভিনয় সমাপ্ত হতে পারেনি। তবুও যতটুকু অভিনয় হয়েছিল বৃন্দাবন দাস তাঁর বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। তা ছাড়া নিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যকালে অভিনয়পটুতা, সংলাপ নির্মাণ ও নাট্য নির্দেশনার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তারও ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক জীবনলীলার পাশাপাশি নবদ্বীপ-কেন্দ্রিক বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ইতিহাসকে বৃন্দাবন দাস স্পষ্ট করে তুলেছেন। যোড়শ শতাব্দীর বাংলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের আকর এই গ্রন্থ। সে সময় হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান। ওড়িশার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ‘দেবমূর্তি’ দেউল-বিশেষ ভাঙলেও তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রকাশ্যে ধর্মাচরণের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন- ‘চৈতন্যভাগবত’এ বৃন্দাবন দাস এমনই বিবরণ দিয়েছেন।

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির গোঁড়ামি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যেত, সর্বোপরি ‘চৈতন্যভাগবত'-এ এক উদার মানবিক ভেদাভেদহীন মানবসমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। ভক্ত হরিদাসের কুল পরিচয় প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস জানালেন – ‘

‘জাতি কুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।

জন্মিলেন নীচকুলে ঈশ্বর আজ্ঞাতে।।’

এই সামাজিক বিপ্লবের ইতিহাসে ‘চৈতন্যভাগবত’ অনবদ্য।

১৩.৮। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে সমাজ চিত্র

বৃন্দাবন দাস ছিলেন সমাজমনস্ক কবি। তাই শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যজীবনের বর্ণনার পাশাপাশি তিনি তাঁর 'চৈতন্যভাগবত'-এ সমাজের বহুবিধ দিককে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। বৃন্দাবন দাসের সমকালীন নবদ্বীপ ছিল একাধারে বাণিজ্য-কেন্দ্র এবং বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান। নবদ্বীপ ছিল সমৃদ্ধ জনপদ। ভারতবর্ষের বহু দূর-দূরান্তর থেকে বাণিজ্য ও বিদ্যাচচার জন্য নবদ্বীপে এসে অনেকেই বসতি স্থাপন করেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রও তেমনই বর্তমান পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসেছিলেন বিদ্যাচ্চার জন্য এবং নবদ্বীপেই তিনি স্থায়ীভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। বহু জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতের সমাবেশে নবদ্বীপ সর্বদা মুখর হয়ে থাকত। কবি বৃন্দাবন দাসের ভাষায়-

'নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে।

একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥

ত্রিবিধ বসয়ে একো জাতি লক্ষ লক্ষ।

সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ।।'

ভারতবর্ষের অন্যতম পীঠস্থান নবদ্বীপ সম্পর্কে তাই বলা যায়, 'নবদ্বীপ হেন গ্রাম নাঞি ত্রিভুবনে'। নবদ্বীপের এই সমৃদ্ধির পাশাপাশি তার দীনরূপ, অন্ধকারের ছবিও কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। নবদ্বীপের মানুষের ভক্তিহীন অচরিতার্থ জীবনের ভোগ পরায়ণতার কথা, উপার্জিত অর্থের অপাত্রে বিনষ্টির কথা, তামসিক পূজার কথাও কবি আমাদের জানিয়েছেন। কিংবা 'বুলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম। / নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান'। এইসব উক্তির মধ্য দিয়ে নবদ্বীপের সমাজের রিক্ততার ছবিই ফুটে ওঠে। আত্মসুখপরায়ণ, ভক্তিহীন সমাজের এই বণনার মধ্য দিয়ে বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপেসমাজের যথার্থ ইতিহাস ভুলে ধরে নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

তৎকালীন সমাজ ছিল মূলত গ্রাম-ভিত্তিক। বিভিন বৃত্তিধরী মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতার মাধামে সমাজে ভারসাম্য রক্ষা করে চলত। উচ্চ শ্রেণির মানুষের সঙ্গে নিম্ন

শ্রেণির মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু গ্রামভিত্তিক সমাজে কুমোর, গন্ধবণিক, তাঁতি, মালাকার, গোয়ালা, তাম্বুলী, শঙ্খবণিকাদি শ্রেণির মানুষেরা তাদের পারস্পরিক সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে নিজ নিজ রুচি সংস্কার, ধ্যান-ধারণা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই দিনাতিপাত করত। বৃন্দাবন দাস তৎকালীন সমাজে নারী-পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রসাধনী দ্রব্যাদি, সামাজিক লোকাচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। সেকালে নারীদের মতো পুরুষেরাও দীর্ঘ কেশ রাখত। সমাজে বিভিন্ন লোকাচার, যেমন - নান্দীমুখ, গঙ্গাপূজা, ষষ্ঠীপূজা, স্ত্রীবরণ, তৈলস্নান ইত্যাদির প্রচলন ছিল।

তৎকালীন সমাজে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্মীয় গোঁড়ামি বা অন্ধত্ব ছিল। সমাজে জোর করে ধর্মান্তরকরণেরও প্রচলন ছিল। পাশাপাশি বামাচারী তান্ত্রিকগণের দাপটও বেশ ছিল। লোকে মনসা-বাশুলী পূজা করত, মদ্য-মাংস দিয়ে যক্ষ পূজা করত, রাত জেগে মঙ্গলচণ্ডীর গান শুনত। তবে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে তাঁর শুদ্ধ জীবনাচরণের আদর্শের ফলে নবদ্বীপে এক জাতপাতহীন ভেদবুদ্ধিহীন উদার ও মহান মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। অধম-পতিত-নীচ-পাপাচারী মানুষেরাও খুঁজে পায় এক নতুন ভাবাদর্শ, যার ছারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা নতুন করে বাঁচার দিশা খুঁজে পায়।

বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত'-এ তৎকালীন সমাজে নাট্যাভিনয়ের বর্ণনাও দিয়েছেন। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভুও যে নাটকে অংশ গ্রহণ করেছেন, তার বিবরণ দিয়েছেন। সুতরাং তৎকালীন সমাজে পুরাণ-নির্ভর বিভিন্ন কাহিনি চরিত্রানুযায়ী পোশাকে সজ্জিত হয়ে সংলাপ-আকারে পরিবেশনের রীতি ছিল- 'চৈতন্যভাগবত'এ তার স্পষ্ট পরিচয় আছে।

সমাজে বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবী, যেমন - মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, বাশুলী, যক্ষ প্রমুখের পূজা ধুমধামের সঙ্গে হত 'চৈতন্যভাগবত'-এ তারও উল্লেখ পাই। বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন। 'মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষপুজা করে .....'। সমাজে শিষ্টচারের বড়োই অভাব ছিল, এমনকি অধিকাংশের কোনো সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ছিল না। ভক্তিতত্ত্ব সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণাও ছিল না। হিন্দুসমাজের অধিকাংশ লোক ছিলেন পঞ্চোপাসক, স্মার্ত। সমাজে

অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কারেরও বহুল প্রচলন ছিল। অর্থাৎ তৎকালীন সমাজের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবক্ষয় অধোগতির এক স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে 'চৈতন্যভাগবত'এ।

তবে এই অধঃপতন ও অবক্ষয়ের সময়েও নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ ছিল যথেষ্ট উন্নত, মার্জিত, রুচিশীল ও সংস্কৃতিবান। সূক্ষ্ম ও সুগভীর ভগবদ্চর্চার অধিকারী কেবল বৈষ্ণবেরাই ছিলেন। এই বৈষ্ণব সমাজের মুখ্য নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য। অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস, হরিদাস, নিত্যানন্দ, মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ-সঞ্জয়, চন্দ্রশেখরাদি প্রমুখ বৈষ্ণবগণের শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি, আচার-আচরণ, সংস্কৃতিমনস্কতা, উন্নত আধ্যাত্মিক চেতনা, ভক্তিভাব শুধু সেকালেরই আদর্শ নয়, সকল কালের সকল দেশেরই আদশস্থানীয়। কারণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আপনি আচরি ধর্ম সকল জীবকে সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে প্রেমভক্তি প্রচার করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে নব প্লাবন এনেছিলেন তিনি। তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজ কীর্তন গানের দ্বারা দারুণভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল। অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম শুধুমাত্র গুটিকয় বৈষ্ণবের মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ ছিল না, আপামর ভারতবাসীর মধ্যে তার শুভত্ব-মহত্ব বিস্তার লাভ করেছিল। চণ্ডাল-পতিত জনের ঘরে ঘরে গিয়ে নিত্যানন্দ প্রভু হরিনাম বিতরণ করেছেন।

বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত'-এ ষোড়শ শতাব্দীর প্রাককালের বাঙালি সমাজ ও জীবনযাত্রার বিশ্বস্ত বিবরণ দিয়েছেন। তাই 'চৈতন্যভাগবত' সেকালের বাঙালির জীবনচর্চা ও জীবনচর্যার দর্পণ হয়ে উঠেছে। তাই 'চৈতন্যভাগবত'কে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির আকর গ্রন্থ বললে অত্যুক্তি হয় না।

১৩.৯। অনুশীলনী

১। 'চৈতন্যভাগবত'এ বর্ণিত চৈতন্যদেবের চরিত্র আলোচনা করুন।

২। 'চৈতন্যভাগবত'-এ বর্ণিত নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র আলোচনা করুন।

৩। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাস পণ্ডিতের চরিত্র বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৪। 'চৈতন্যভাগবত'-এ সাধারণ মানুষের পরিচয় কীভাবে বিধৃত হয়েছে আলোচনা করুন।

মন্তব্য

৫। শ্রীচৈতন্যদেবের দেবসত্তা ও মানবসত্তার পরিচয় দিন।

৬। 'চৈতন্যভাগবত'-এ ইতিহাসের তথ্য ঘটনা কতটা পরিবেশিত হয়েছে আলোচনা করুন।

৭। 'চৈতন্যভাগবত'এর সমাজচিত্র বিস্তৃত আলোচনা করুন।

৮। 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটির আঙ্গিক বিচার করুন।

৯। 'চৈতন্যভাগবত'-এর আদি খণ্ডের সংক্ষিপ্ত গদ্যরূপ লিখুন।

১০। 'চৈতন্যভাগবত'-এর মধ্য খণ্ডের সংক্ষিপ্ত গদ্যরূপ লিখুন।

১১। 'চৈতন্যভাগবত'-এর শেষ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত গদ্যরূপ লিখুন।

১২। বৈষ্ণব জীবনীকার হিসাবে বৃন্দাবন দাসের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

১৩। 'চৈতন্যভাগবত' টির নামকরণ প্রসঙ্গ আলোচনা করুন।

১৪। 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের ভাষা-ছন্দ-অলংকারাদি বিচার করুন।

১৫। 'চৈতন্যভাগবত'-এর মধ্য ও শেষ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

১৩.১০। গ্রন্থপঞ্জি

১. শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত - ড. রাধাগোবিন্দনাথ সম্পাদিত

২. শ্রীচৈত্যভাগবত - ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত

৩. শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত - অধ্যাপক দুর্গাপদ গাঙ্গুলী সম্পাদিত

৪. শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত - প্রণয়কৃষ্ণ বসু সম্পাদিত

৫. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম) - ড. সুকুমার সেন

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য়) - ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম) - ড. ভূদেব চৌধুরী

৮. বাংলার সাহিত্য লোক (১ম) - ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা

৯. শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান - ড. বিমানবিহারী মজুমদার

১০. বৈষ্ণব চরিত সাহিত্য - ড. গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী

একক: ১৪ : চৈতন্যভাগবত- এর বিভিন্ন দিক ও আঙ্গিক বিচার

বিন্যাসক্রম

১৪.১। বৈষ্ণব জীবনীকার হিসাবে বৃন্দাবন দাসের কৃতিত্ব

১৪.২। বর্তমান কালের দৃষ্টিতে চৈতন্যভাগবত- এর প্রয়োজনীয়তা

১৪.৩। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ দুটির তুলনা

১৪.৪। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের ভাষা-ছন্দ ও অলংকার

১৪.৫। অনুশীলনী

১৪.৬। গ্রন্থপঞ্জি

১৪.১। বৈষ্ণব জীবনীকার হিসাবে বৃন্দাবন দাসের কৃতিত্ব

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম শ্রীচৈতন্যজীবনী রচনার কৃতিত্ব বৃন্দাবন দাসের। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'। 'চৈতন্যভাগবত' বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম দীর্ঘ রচনা, যেখানে দেবদেবী নেই, কোনো অতিরঞ্জিত গল্প নেই, এক অতিপরিচিত নিতান্ত সাধারণ বাঙালি মানুষ - যিনি মহামানবে উন্নীত হয়েছেন, তাঁরই জীবনকাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

বৃন্দাবন দাস পরম বৈষ্ণব, ভক্ত কবি। 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' তাঁর প্রথম ও সার্থক জীবনীগ্রন্থ হলেও তিনি আরও জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'নিত্যানন্দ চরিতামৃত' চরিতগ্রন্থ। শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে তাঁর আরও অনেক গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন- 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় গ্রন্থ', 'চৈতন্যলীলামৃত' ইত্যাদি।

সুতরাং বৈষ্ণব জীবনীকার হিসাবে বৃন্দাবন দাসের এক ঐতিহ্যময় সমৃদ্ধশালী প্রতিভা লক্ষিত হয়। বৃন্দাবন দাসের সমকালে বহু ব্যক্তির দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্যদেব যে ঈশ্বর বলে পরিজ্ঞাত ছিলেন, তার বাস্তবনিষ্ঠ শাস্ত্রসম্মত সমর্থনসহ প্রকাশ 'চৈতন্যভাগবত'-এ দৃষ্ট হয়। এইভাবে সমকালীন কোনো ব্যক্তিত্বকে ঈশ্বর বলে প্রতিপন্ন করানো কম কৃতিত্বের নয়। ভক্তি ও অনুরাগ রঞ্জিত লৌকিক-অলৌকিকের মিশ্রণে শ্রীচৈতন্য চরিত্রের ইতিহাসনিষ্ঠতা 'চৈতন্যভাগবত'কে স্বতন্ত্র মর্যাদা এনে দিয়েছে। ভারতীয় আধুনিক ভাষার সাহিত্য এ এক অভিনব সৃষ্টি।

ভক্তি-শিরোমণি গ্রন্থ 'ভাগবত'-এর সমতুল বিবেচনা করে পরিকল্পিতভাবে সংস্কৃতকে এড়িয়ে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ রচনার দীর্ঘ প্রস্তুতি ও সার্থক রূপায়ণ - বৃন্দাবন দাসের অভিনব কৃতিত্ব। দৈববাদনির্ভর মধ্যযুগে যেখানে দৈববাণী বা দৈবস্বপ্নই ছিল গ্রন্থরচনার মূল প্রেক্ষাপট, সেখানে বৃন্দাবন দাস অকপটে স্বীকার করেছেন-

'অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।

চৈতন্য চরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে।।'

বৃন্দাবন দাসের পরে বাংলা ভাষায় আরও কয়েকজন চৈতন্যজীবনী রচনাকারের নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য লোচন দাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দ দাস প্রমুখ। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ ছাড়া অন্য জীবনীকারদের গ্রন্থের তুলনায় বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ অত্যন্ত সহজ, সরল, অনাড়ম্বর অথচ কাব্যমাধুর্যমণ্ডিত। বৃন্দাবন দাসের অগ্রজ সংস্কৃত জীবনীকারগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণ বলে উপলব্ধি করার সংবাদ আকারে-ইঙ্গিতে পাঠকদের জানিয়েছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাস আকার-ইঙ্গিতের পথ পরিহার করে শ্রীচৈতন্যই যে শ্রীকৃষ্ণ - তা স্পষ্ট করে শাস্ত্রসম্মতভাবে জানালেন। এই দৃঢ়তার কারণ প্রভু নিত্যানন্দ। কারণ প্রভু নিত্যানন্দের নিকট থেকে 'বৈষ্ণব তত্ত্ব' বুঝেছিলেন এবং ভাগবত আস্বাদন করেছিলেন বৃন্দাবন দাস।

বৃন্দাবন দাস যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি কম ছিল না। ফলে 'চৈতন্যভাগবত' এ সর্বত্রই মার্জিত, রুচিসম্পন্ন সুস্থ সংস্কৃতির ছাপ লক্ষিত হয়।

'চৈতন্যভাগবত'এর ভাষা ব্যবহার, ছন্দ, অলংকারের প্রয়োগও যথেষ্ট উন্নত। সুতরাং ধর্মপিপাসু বা সাহিত্যরসপিপাসুদের কথা ছেড়ে দিলেও বৈষ্ণব জীবনীকার হিসাবে বৃন্দাবন দাসের কৃতিত্ব অনবদ্য। বিশেষ করে গ্রন্থটিতে এমন সব ঐতিহাসিক তথ্যের নির্দেশ বা ইঙ্গিত আছে যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

বাংলা ভাষার মার্জিত, সুস্থ সংস্কৃতিসম্পন্ন গ্রন্থ রচনার ভিত্তি ভূমিটি প্রথম সার্থকভাবে নির্মাণ করলেন বৃন্দাবন দাস। চৈতন্য জীবীগ্রন্থ রচনার মাধ্যমে একদিকে যেমন বাংলা ভাষার মার্জিত বুনিয়াদ নির্মাণ করলেন, অপরদিকে সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি পূর্ণ মনুষ্যত্ব বা মানবিকতার প্রকাশ হয়। যার ফলশ্রুতি নির্মল আনন্দ - তা পরিশুদ্ধ ভাবে একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবেই বিদ্যমান। সুতরাং বৈষ্ণব জীবনীকার হিসাবে বৃন্দাবন দাসের কৃতিত্ব সর্বাগ্রে।

১৪.২। বর্তমান কালের দৃষ্টিতে চৈতন্যভাগবত-এর প্রয়োজনীয়তা

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক জীবনীগ্রন্থ 'চৈতন্যভাগবত'। শ্রীচৈতন্য নবরূপে আবির্ভূত হলেও তিনি নারায়ণই - বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থ এই তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'ভাগবত'-এর 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণ', শ্লোকের উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের ভগবদ্সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করেছে। সুতরাং অসীম, অনন্ত, বিভু স্বরূপ প্রেমঘন, আনন্দঘন, বিজ্ঞানঘন, সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে যে ভগবান তাঁর মনুষ্যাকার নিয়ে যথেষ্ট সংশয় থাকাটাই স্বাভাবিক। এই কারণেই ভগবদস্বরূপ রহস্যময়, দুর্জেয়, কুহেলিকাচ্ছন্ন। কারণ ঈশ্বরতত্ত্ব হল অপ্রাকৃত তত্ত্ব। প্রাকৃত দৃষ্টি বা প্রাকৃত বুদ্ধি নিয়ে অপ্রাকৃত তত্ত্বকে উপলব্ধি বা অনুভব করা যায় না। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই কারণে বলেছেন-

'ঈশ্বরের কৃপালেশ হইয়াছে যাঁহারে।

সেই তো ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিবারে পারে।।'

অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝতে গেলে ঈশ্বরের কৃপা-কণা চাই। ঈশ্বরের সে কৃপাকণা আসে মহতের মাধ্যমে। মহতের কৃপা ব্যতীত ঈশ্বরতত্ত্ব অনুভব করা যায় না। বৃন্দাবন দাসের জননী নারায়ণী দেবী শৈশবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'অধরামৃত' তাম্বুল প্রসাদ পেয়েছিলেন, বৃন্দাবন দাসের মাতামহ মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিত। সুতরাং এক সুগভীর পরম্পরাগত অপ্রাকৃত ধারা তাঁর মধ্যে বিরাজমান। সর্বোপরি তিনি পরম উদার, মহাকারুণিক, দয়াল শিরোমণি প্রভু নিত্যানন্দের স্নেহ-ধন্য শিষ্য। ফলে বৃন্দাবনের দৃষ্টি, বুদ্ধি, অনুভব ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা সবই অপ্রাকৃত। তাঁর সৃষ্ট 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থও অপ্রাকৃত। যদিও অপ্রাকৃত জীবনালেখ্য বর্ণনার পাশাপাশি তিনি সমকালীন সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনৈতিক চালচিত্র, ধর্মীয় পরিবেশ- সকলই বর্ণনা করেছেন। আর এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

শ্রীচৈতন্যদেবের মতো ব্যক্তিত্ব সর্বদেশ, সর্বকাল, সর্বসমাজের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। তাঁর দেবোপম চারিত্রিক মহিমা দেশকালাতীত। সুতরাং তাঁর চরিত্রালেখ্যসমৃদ্ধ প্রথম বাংলা ভাষায় সার্থক গ্রন্থ 'চৈতন্যভাগবত'-এর গুরুত্ব অপরিসীম। পাশাপাশি মধ্য যুগের নানা চালচিত্র বিশেষ করে অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিকের অনুপুঙ্খ বর্ণনা বৃন্দাবন দাসের লেখনীতে এমনভাবে পরিস্ফুট হয়েছে যে একে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির আকর গ্রন্থ বললে অত্যুক্তি হয় না। তা ছাড়া শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালে বাংলার শাসনব্যবস্থা, সামাজিক অবস্থা, অর্থনীতি ও জনসাধারণের যে ছবি 'চৈতন্যভাগবত'-এ প্রকাশ পেয়েছে তা যেমন বস্তুনিষ্ঠ, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি শূন্য তেমনই ইতিহাস সম্মত।

১৪.৩। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ দুটির তুলনা

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক জীবনীগ্রন্থ। রচনা-গৌরবে এই গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে প্রথম মৌলিক গ্রন্থের মর্যাদার অধিকারী। বৃন্দাবন দাসের পরবর্তীকালে যে সকল কবি চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ লিখে প্রশংসাধন্য হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ

দুজনের কেউই শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করেন নি। বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় জন্মালেও তাঁকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ তাঁর হয়নি বলে, তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন-

'হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখনে।

হইলাঙ বঞ্চিত সে সুখ দরশনে।'

প্রভু নিত্যানন্দের আদেশেই তিনি 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' লিখেছেন; গ্রন্থে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-

'অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।

চৈতন্য চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে।।'

কিংবা,

'নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা করি শিরে।

সূত্র মাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে।।'

বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থ শ্রীচেতন্যের জীবনের প্রথম ভাগের অর্থাৎ নবদ্বীপ লীলার বিস্তৃত বর্ণনা দিলেও দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ নীলাচল বা গম্ভীরালীলার তেমন বর্ণনাই দেননি। 'চৈতন্যভাগবত'-এর আদি খণ্ড সুবিস্তৃত হলেও মধ্য ও অন্ত্য খণ্ড যথেষ্ট সংক্ষেপিত। এর কারণ হিসাবে বলা যায়, নিত্যানন্দ প্রভু বা নবদ্বীপের প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তবৃদের কাছ থেকে তিনি যে পরিমাণ তথ্য পেয়েছিলেন, উপরন্তু তাঁর ভক্ত-কবিমনে যে গৌরাঙ্গভাবান্দোলন শুরু হয়েছিল তাতে করে নবদ্বীপ লীলাই সূক্ষ্ম ও অনুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করাই তাঁর পক্ষে সহজ ও সংগত ছিল। কিন্তু পুরী-লীলার প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে, বিশেষ করে গম্ভীরার শেষ বারো বছরের দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। গম্ভীরা লীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষী স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ অন্তরঙ্গ এই দুই ভক্ত পার্ষদের সঙ্গে বৃন্দাবন দাসের কখনও সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে জানা যায় না। গম্ভীরা লীলার আর এক অনুভবী অন্তরঙ্গ ভক্ত পার্ষদ রঘুনাথ দাস, মহাপ্রভু এঁকে স্বরূপ

দামোদরের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন এবং সেই থেকে রঘুনাথের নাম হয় 'স্বরূপের রঘুনাথ'।

'চৈতন্যভাগবত' রচনার প্রায় পঞ্চাশ বছর পর রচিত হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'। রচনা গৌরব, কবিত্ব, দর্শন, তত্ত্ব, প্রামাণ্য তথ্য সমস্ত কিছুতেই এই গ্রন্থখানি সর্বোৎকৃষ্ট। তার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবনের, অলৌকিক দিব্য জীবনের সুতীব্র বিরহ দশার বর্ণনা কেবল কৃষ্ণদাসই দিয়েছেন। আর এ সমস্ত তথ্য তিনি দীর্ঘদিন বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডে রঘুনাথ দাসের অন্তরঙ্গ সেবকরাপে শ্রবণ ও আস্বাদন করেছেন। রঘুনাথ দাস আবার এই গূঢ় তত্ত্ব আস্বাদন করেছেন স্বরূপ দামোদরের নিকট। স্বরূপ দামোদর তাঁর কড়চায় মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা রচনা করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই কড়চাকে অবলম্বন করেই 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের অন্ত্যলীলা বর্ণনা করেছেন-

'প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর।

সূত্র করি রাখিলেন গ্রন্থের ভিতর।।'

তবে 'চৈতন্যভাগবত ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ দুটি একে অন্যের পরিপূরক। 'চৈতন্যভাগবত'-এর মতো ঘটনার ঘনঘটা 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ না থাকলেও বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের সার সংকলন, দৃঢ় শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ও প্রেমকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পিনবদ্ধ করার নৈপুণ্যে গ্রন্থটি অনবদ্য হয়ে উঠেছে। তবে গ্রন্থ দুটির বিষয় এক হলেও ভাবের দিক থেকে কিছু পার্থক্য আছে। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের অসম্পূর্ণতাকে কৃষ্ণদাস সম্পূর্ণতা দান করেছেন। বৃন্দাবন দাসের কাব্য যেখানে যেখানে অস্পষ্ট ও অপরিণত, কৃষ্ণদাস সেই সেই স্থানকে স্পষ্টতা ও পূর্ণ পরিণতি দান করেছেন। আবার বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের জীবনের যে যে অংশগুলির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, কৃষ্ণদাস সেই অংশগুলি সংক্ষিপ্ত করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব বা দর্শনের ব্যাখ্যায় বৃন্দাবন দাস যেখানে কিছুটা নীরব, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সেখানে সরব। আসলে অগ্রজ কবির প্রতি পূর্ণ

শ্রদ্ধাশীল থেকে মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবন দাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন-

'বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।

তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ।।

চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।

তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ।।'

অগ্রজ কবির প্রতি এত অবিচল শ্রদ্ধা-ভক্তি সত্যিই বিরল।

মধ্যযুগের স্বনামধন্য দুই কবি তাঁদের গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ সম্পর্কে পৃথক পৃথক ধারণা ব্যক্ত করেছেন। বৃন্দাবন দাস প্রধানত ভারতীয় ঐতিহ্যকে স্মরণে রেখে অবতারবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে গীতার 'যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। ....' শ্লোককে অনুসরণ করেছেন। কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গই যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং তিনিই এক দেহে রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ - এ কথা তিনিই প্রথম পাঠককুলকে জানান। বৃন্দাবন দাস বলেন-

'কলিযুগে ধর্ম হয় হরি সংকীর্তন।

সব প্রকাশিলেন চৈতন্য নারায়ণ।।

কলিযুগে সংকীর্তন ধর্ম পালিবারে।

অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব পরিবারে।।'

বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যাবতারের প্রধান কারণ রূপে হরিসংকীর্তন বা হরিনাম প্রচারের কথা বলেছেন কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ হরি সংকীর্তন বা নামসংকীর্তনকে চৈতন্যাবতারের গৌণ কারণ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, ভূ-ভার হরণ ও চৈতন্য অবতারের মূল কারণ নয়। চৈতন্যাবতারের মুখ্য কারণ সম্পর্কে স্বরূপ দামোদর তাঁর কড়চায় জানিয়েছেন-

‘শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা।

স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।।

সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেত্তি লোভা।

তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শাচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।’

দ্বাপর যুগে বৃন্দাবনলীলায়, শ্রীকৃষ্ণের তিনটি লোভ বা বাসন অপূর্ণ ছিল- সেই তিন বাসনা পূরণ করতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, রাধাভাবকান্তি অস্বীকার করে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে শচীগর্ভ সিদ্ধুতে আবির্ভূত হলেন। সেই তিন বাসনা হল-

(ক) শ্রীরাধার প্রেমমহিমা কেমন।

(খ) শ্রীরাধার দ্বারা আস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণের আপন অদ্ভুত মাধুর্য কেমন।

(গ) শ্রীকৃষ্ণের সেই মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীরাধার সুখই বা কেমন।

স্বরূপ দামোদরের এই সিদ্ধান্তকে পূর্ণ সমর্থন করে কৃষ্ণদাস কবিরাজও লিখলেন-

‘রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে।

সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে।।

রাধাভাব অঙ্গীকারে ধরি তার বর্ণ।

তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ।।’

সুতরাং বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনায় চৈতন্য অবতারের কারণ ভিন্ন ভিন্ন। তবে উভয় কবিই অবতারত্ত্বের প্রশ্নে শ্রীচৈতন্য যে রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ একথা স্বীকার করেছেন।

‘চৈতন্যভাগবত’এ শ্রীচৈতন্যদেব একাধারে মানসিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মিলিত বিগ্রহ, ভক্তিরস ও জীবনরসের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে চৈতন্যদেব উজ্জ্বল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-তত্ত্বের প্রকাশ ‘চৈতন্যভাগবত’-এ তেমন নেই; এমন কি রূপ-সনাতন,

রায় রামানন্দ, জীবগোস্বামী, স্বরূপ দামোদর, রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রমুখ পার্ষদ ভক্তবৃন্দের কথা তিনি বলেননি। সুতরাং চৈতন্যভাবধারার আকর গ্রন্থ হিসাবে 'চৈতন্যভাগবত' অপেক্ষা 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর গুরুত্ব অনেক বেশি।

তিন খণ্ডে বিভক্ত 'চৈতন্যভাগবত'-এর শেষ খণ্ডটির যেন আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের এই অসম্পূর্ণতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ পূরণ করেন তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ। কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে মহাপ্রভুর শেষ বারো বছরের দিব্যোন্মাদ অবস্থা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের নিরিখে অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। 'চৈতন্যভাগবত'এ মুখ্যত শ্রীচৈতন্যদেবের বিচিত্র ঘটনার ঘনঘটাময় নবদ্বীপ লীলার বর্ণনা পাওয়া যায়। পাওয়া যায় তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় চালচিত্র, সেদিক দিয়ে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। আর তত্ত্ব-দর্শন-গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত, কবিত্বে শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যজীবনের রহস্যময় অন্তগূঢ় প্রেমভক্তিময় ভাবসাধনার প্রকাশে 'চৈতন্যচরিতামৃত' অভূতপূর্ব অনন্যসাধারণ, তবে গ্রন্থদুটির মধ্যে কোথাও পারস্পরিক বিরোধিতা নেই। বরং অগ্রজ কবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে কৃষ্ণদাস লিখেছেন-

'চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।

তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ।।'

১৪.৪। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের ভাষা-ছন্দ ও অলংকার

ভাষা:

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ না হলেও প্রথম গ্রন্থ বলে পরিগণিত হবার মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী। ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন- "বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে তাঁহার সমসাময়িক

ভাষা প্রায় সবটাই অনবলুপ্ত রহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থটির এই এক বিশেষ মূল্য । ..... ভারতীয় আধুনিক ভাষার সাহিত্যে এ অভিনব সৃষ্টি। সুতরাং একটু অতিরিক্ত ঐতিহাসিক মূল্য আছে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের।"

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ভদ্র ও সাহিত্যের ভাষার পরিচ্ছন্ন ও যথাসম্ভব খাঁটি নিদর্শন 'চৈতন্যভাগবত'-এ পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাস তখনকার দিনের মানুষের ভাষাকে অনেকাংশেই তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে তাঁর গ্রন্থের ভাষানির্মাণ যথেষ্ট আধুনিক বলা যায়।

বাংলা ভাষার ইতিহাসগত কালবিভাজনে 'চৈতন্যভাগবত' অন্ত্য-মধ্য পর্বের রচনা। ফলে অন্ত্য-মধ্য পর্বের ভাষা-বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন এই গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় লক্ষিত হয়। তবে ভাষাতত্ত্বের বিচারে ভাষাগত ক্রমবিবর্তন তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু স্থানে স্থানে ভাষার ব্যবহারগত কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। যেমন, স্বরধ্বনির বিলোপ বা দ্বিমাত্রিকতার ব্যবহার নেই। আবার কিছু কিছু জায়গায় এমন সব শব্দের ব্যবহার ঘটেছে যেগুলি দুর্বোধ্য না হলেও কবির অভিপ্রায় ছাড়া বোঝা অসম্ভব। ড. রাধাগোবিন্দ নাথ এমনই কিছু কিছু দুর্বোধ্য উক্তির উদাহরণ দিয়েছেন-

১. 'শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।'

২. 'কেহো বলে জাতিসর্প তেঞি না লঙ্ঘিল।'

৩. 'ঘরে যাহ তুমি রোগী দঢ় কর গিয়া।'

৪. 'প্রথমে বিজয় করিলেন গঙ্গাতীরে।

পূর্ণ চন্দ্র ধরিলেন শিরের উপরে।'

৫. 'বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ।

মারিলেন হেন দেখি জেঠা বলরাম।।'

৬. 'বস্ত্র লাগি হইতে লাগিল রাত্রিশেষ।'..... ইত্যাদি।

অপ্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এমন বেশ কিছু শব্দের উল্লেখ 'চৈতন্যভাগবত'এ পাওয়া যায়। যেমন, 'আদিবৃদ্ধ' (আদ্যোপান্ত), 'উভিষ্ট' (উৎপাত), 'বিবর্তন' (বিশেষ নৃত্যসেবা পূজাদি) ইত্যাদি।

'চৈতন্যভাগবত'এর ভাষাবৈশিষ্ট্যের আর একটি দিক কিছু সর্বনাম পদের ব্যবহার। যেমন- ইঁহার, ইঁহাকে, তাঁহারা, তাঁহার – ইত্যাদি বোঝাতে বৃন্দাবন দাস ব্যবহার করেছেন 'ইহান', 'ইহানে', 'তাহানা', 'তান' ইত্যাদি পদ। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে এসব পদের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অনুমান করা যায়, এইসব পদ এদেশে চলিত অপভ্রষ্ট পদের জের টেনে এসেছে। 'তছু' পদটিও মনে হয় এভাবেই এসেছে।

'চৈতন্যভাগবত'এ আঞ্চলিক এবং অপভ্রংশজাত শব্দের বাহুল্যও লক্ষিত হয়। যেমন- 'কেন', 'সবে', 'সভে' ইত্যাদি। মৈথিলি, অবহট্ট বা ব্রজবুলি শব্দের ব্যবহারও লক্ষিত হয়। যেমন- 'ঐছন', 'পাওল' 'থৈছে', 'পহুঁ' 'মুঞি', 'ধাঞি' ইত্যাদি।

বৃন্দাবন দাসের কালে – 'ইতে', 'ইয়া' ও 'ইলে' অন্তক পদের ব্যবহারে পার্থক্য ছিল। পরে তা লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন- 'যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়'। 'নাচিতে'র স্থলে বর্তমানে লেখা হয় 'নাচিলে'।

আবার 'ইল', 'ইব' অন্ত ক্রিয়াপদ কর্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন, 'করিবাঙ' (করিব), 'বুঝিবাঙ' (বুঝিব) ইত্যাদি। বিশিষ্ট তৎসম শব্দের প্রয়োগও লক্ষ করা যায়- 'চৈতন্যভাগবতে', যেমন- 'কক্ষা' (ন্যায়ের তর্ক), 'উপস্করি' (পরিষ্কার করে), 'ত্রিদশ' (ঈশ্বর), 'অদ্বৈতব' (সরল হৃদয়), 'অনুপাল্য' (পোষ্য), 'বিষ্ণুখট্টা' (বিষ্ণুর সিংহাসন), 'সংগোপে' (গোপনে) ইত্যাদি।

'চৈতন্যভাগবত'এ রাঢ়ী উপভাষার দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমন- 'থুইলেন' (রাখলেন), 'বিভায়' (বিবাহে), 'এথা' (এখানে)। নামধাতুর প্রয়োগও লক্ষিত হয়। যেমন- 'নমস্কারিল' (নমস্কার করল), 'তুষিলা' (তুষ্ট করল) ইত্যাদি।

বলা যায়, 'চৈতন্যভাগবত'-এর ভাষা ক্রমবিবর্তনের বিরাট দলিল না হলেও তার নিজস্ব স্বভাব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

ছন্দ :

বর্তমান কালের ন্যায় মধ্যযুগে ছন্দ নিয়ে কবিদের তেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কবিরা আখ্যানমূলক কাব্যকাহিনির কায়া নির্মাণে মিশ্রবৃত্ত তথা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আশ্রয় নিয়েছেন। বৃন্দাবন দাসও অক্ষয়বৃত্তের অন্ত্য মিলযুক্ত পয়ার এবং ত্রিপদীতে ধীর লয়ের কাব্য ধারায় 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেছেন। পাঁচালি আকারে লিখিত পয়ারের ছন্দের জনপ্রিয়তাকে তিনি তাঁর কাব্যে গ্রহণ করেছিলেন। যেমন-

দ্বিপদী পয়ারের দৃষ্টান্ত:

১১১ ১২১১ ১১১ ১২

(১) 'শুনিয়া আকাশবাণী / শ্রীগৌর সুন্দর। ৮+৬ = ১৪

১১১১১১১১ ১১১১২

নিবর্ত হইলা প্রভু / হরিষ অন্তর।।' ৮+৬ = ১৪

(২) 'সর্বদেশে হরিনাম হইল প্রচার। ৮+৬ = ১৪

শুনিয়া চৈতন্য প্রভু আনন্দ অপার।।' ৮+৬ = ১৪

ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত :

নাচে বিশ্বম্ভর বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর

ভাগীরথী তীরে তীরে।

যার পদধূলি হই কুতূহলী

অনন্ত ধরেন শিরে।।'

'চৈতন্যভাগবত'-এর প্রায় সমগ্রই দ্বিপদী পয়ারে রচিত। মাত্রা সংখ্যা কোনো কোনো জায়গায় কিছু বেশি। কিছু কিছু ত্রিপদীর ব্যবহারও লক্ষিত হয়।

অলংকার :

ছন্দের মতোই অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বৃন্দাবন দাসের স্বাভাবিকতাই নজরে পড়ে। স্বাভাবিক জীবনভাবনার আলোকেই তিনি নানা অলংকারে সজ্জিত করেছেন তাঁর 'চৈতন্যতাগবত'কে। যেমন-

১. অনুপ্রাস – (ক) 'শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ মোর প্রভু আনন্দ কন্দ

বৃন্দাবন দাস গানে রে।'

(খ) 'সর্ব গর্ব চূর্ণ হয় শুনিয়া সবার।।'

২. যমক – 'কোথা গেল দিব্য বাটা দিব্য গুয়া পান।

কোথা গেল ঝারি যাতে করে জল পান।।'

৩. উপমা – 'তান কন্যা লক্ষ্মী প্রায় রূপে শীলে নামে।'

'বিদ্যুতের প্রায় নৃত্য গতির ভঙ্গিমা।

কিবা সে অদ্ভুত ভুজচালন মহিমা।।'

৪. ব্যতিরেক – 'জিনিয়া কন্দর্প কোটি সর্বাঙ্গের রূপ

চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে মুখ।'

৫. (ক) উৎপ্রেক্ষা – 'লিখন কালির কিছু শোভে গৌর অঙ্গ।

চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গ।।'

৫. (খ) উৎপ্রেক্ষা – 'জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম।

অকথ্য অদ্ভূত প্রেম নদী বহে যেন।।'

৫. (গ) উৎপ্রেক্ষা – 'কখন করেন হেন রোদন বিরহে।

রাজা দেখে শ্রীনয়নে যেন নদী বহে।।'

৫. (ঘ) উৎপ্রেক্ষা – 'বিদ্যুতের প্রায় নৃত্য গতির ভঙ্গিমা।

কিবা সে অদ্ভুত ভূজচালন মহিমা।।'

৫. (ঙ) উৎপ্রেক্ষা – 'শ্রবণ কীর্তন স্মরণাদি নমস্কার।

এই যে তোমার সর্বকালে অলঙ্কার।।

নাগবিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে।

তাহা নাহি সর্বজনে বুঝিবারে পারে।।'

১৪.৫। অনুশীলনী

১। বৈষ্ণব জীবনীকার হিসাবে বৃন্দাবন দাসের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

২। একালের দৃষ্টিতে 'চৈতন্যভাগবত'এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

৩। 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের ভাষা-ছন্দ-অলংকারাদি বিচার করুন।

৪। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থ দুটির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৫। মধ্য যুগের বাংলা কাব্যসাহিত্যে বৃন্দাবন দাসের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৬। 'চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস' - এই উক্তি কতটা সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেন। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

১৪.৬। গ্রন্থপঞ্জি

১. শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত - ড. রাধাগোবিন্দনাথ সম্পাদিত

২. শ্রীচৈত্যভাগবত - ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত

৩. শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত - অধ্যাপক দুর্গাপদ গাঙ্গুলী সম্পাদিত

৪. শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত - প্রণয়কৃষ্ণ বসু সম্পাদিত

৫. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম) - ড. সুকুমার সেন

মন্তব্য

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য়) - ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম) - ড. ভূদেব চৌধুরী

৮. বাংলার সাহিত্য লোক (১ম) - ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা

৯. শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান - ড. বিমানবিহারী মজুমদার

১০. বৈষ্ণব চরিত সাহিত্য - ড. গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী